আসরবাণী

প্রতিষ্ঠাদিবস সংখ্যা

বর্ষ ১৬ • ২য় সংখ্যা

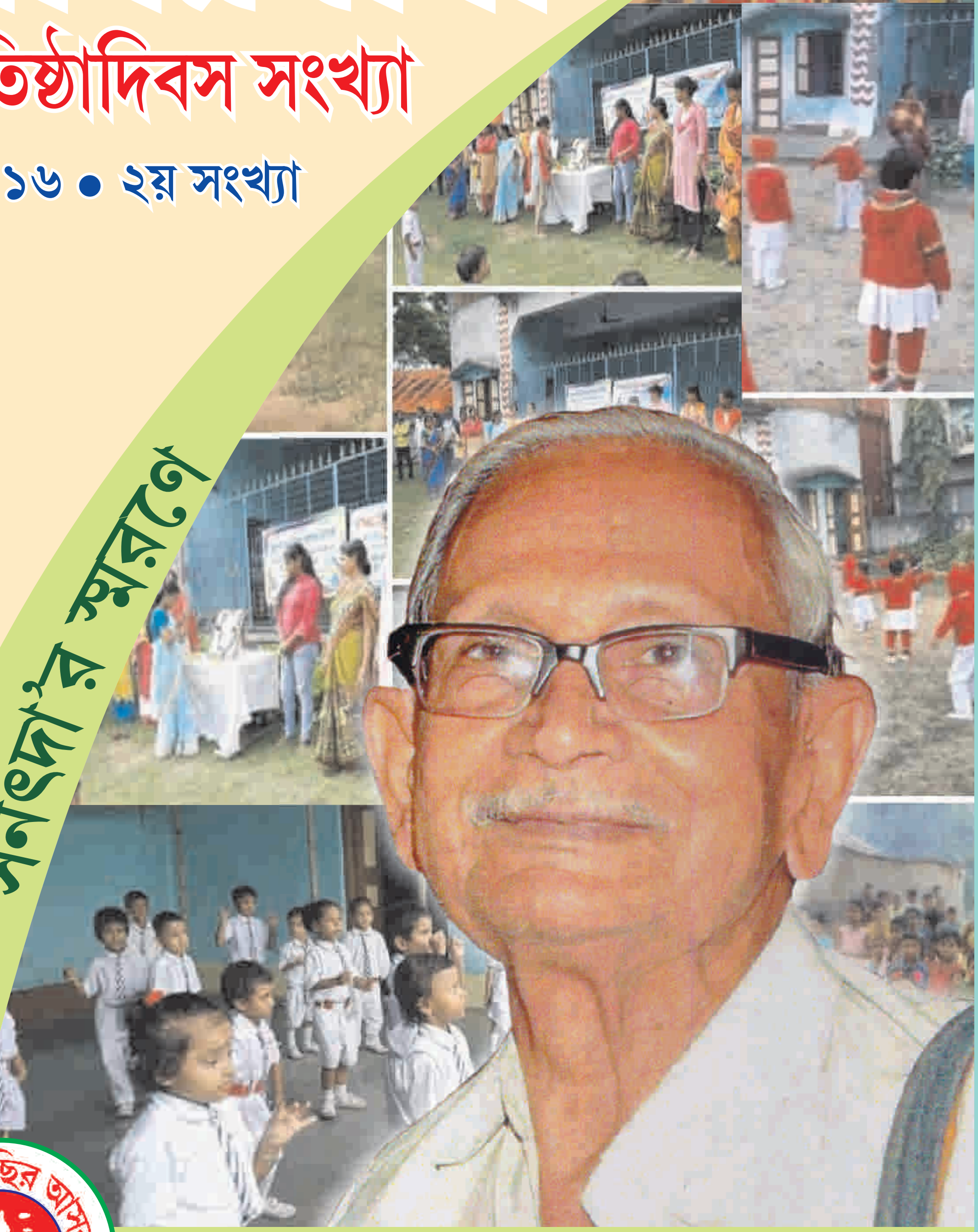

সনৎদা'র স্মরণে

সবপেয়েছির আসর
মূলকেন্দ্র

সবপেয়েছির আসর

সবপেয়েছির আসরের ত্রৈমাসিক পত্রিকা

আসরবাণী

বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২

প্রতিষ্ঠাদিবস সংখ্যা

সূচী

১। আমার চোখে সনৎদা
— তপন গুপ্ত

২। সনৎদাকে নিয়ে একটা তথ্যচিত্র তৈরি করার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।
— অশোক বসু

৩। গুরু ব্রহ্মা
— শ্রুতি ঘোষ

৪। সনং হেঁসেলে হরিণছাড়া
— তপতী মণ্ডল

৫। সনৎদার স্মরণে গদ্য ও পদ্যগুচ্ছ

৬। সঙ্কট নিয়েও সংগঠন এগিয়েছে নতুন কদমে
— সনৎ ভট্টাচার্য্য

৭। সেদিন অঞ্চল গড়তে গিয়ে আঘাত পেয়েছি
— অতুল বিশ্বাস

৮। যেথায় আছে শুধু ভালোবাসা বাসি
— শ্রী মাষ্টার মশাই

৯। শিশু ও কিশোর সংগঠন দর্শনে সবপেয়েছির আসরে ভূমিকা
— উৎপল হোম রায়

১০।আমার প্রাণের মানুষ সনৎদা
— স্বপন কুমার রায়

১১।টুম্পার মিতালি (নাটক)
— প্রদীপ রায়

নিবেদন তোমাকে সনৎদা

তারাদের জগৎ থেকে ধ্রুবতারাটি খসে পড়ার দুঃস্বপ্নটিও দেখতে হল আমাদের। সবপেয়েছির আসরের সব পাওয়ার বাস্তব থেকে আমরা হলাম নিঃস্ব।

ভগ্ন হৃদয়ে নতুনভাবে আবার সবকিছু গড়ে তোলার শিক্ষাটা তুমি হয়ত দান করেছ আমাদের। মনে তবুও শঙ্কা, পারব কি? চেষ্টা করতে হবে আমাদের এটা জানি এবং মান্য করি।

হে স্বজন — 'না ফেরার দেশ' থেকে
আমাদের স্মরণে রেখো।

— সবপেয়েছির আসরে
আপনার অনুগতরা

আমার চোখে সনৎদা

তপন গুপ্ত

(উপদেষ্টা, স.পে.আ.)

আমার প্রিয় সংগঠন সবপেয়েছির আসরের প্রাণময় পুরুষ, আমার এত প্রাণপ্রিয়, আসরের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষক চিরশিশু সনৎদা, যার মন শিশুর মত সরল তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আমার মতে সবপেয়েছির আসর হল সনৎদা। সনৎদা মানে সবপেয়েছির আসর।

আমি আমার আসর জীবনে এমন সৎ, সুন্দর, শিশুদরদী সবপেয়েছির আসরের কর্মী ও সোনারকাঠিদের পথপ্রদর্শক কাউকে দেখিনি। তাঁর সুন্দর ব্যবহার, কর্মোদ্যম, সকলের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ। আমার আসর জীবনে প্রেরণা ও আদর্শ হল সনৎদা।

সনৎদাকে আমি প্রথম দেখি সম্ভবত ২০১৮ সালে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া স্কুলে অনুষ্ঠিত সোনারকাঠিদের বার্ষিক শিবিরে। আমার জীবনের এটাই প্রথম বার্ষিক শিবির। আমাদের আসরের গর্বই হল সনৎদা। আমি সেই শিবিরে সনৎদাকে ছোটদের ছড়ার ব্যায়াম শেখাতে দেখে অভিভূত হই। সনৎদাকে দেখে এমন মনে হয়েছিল যেন সেই ছোট ছোট সোনারকাঠিদের সাথে মিলে গেছে। তখন থেকেই সনৎদার প্রতি আমার হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরে যায়। পরবর্তী কালে সনৎদার খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাই আমি। সনৎদার না আছে কোন কৃত্রিম গাম্ভীর্য ও না আছে কোন অহংকার, যাকে বলে একেবারে মাটির মানুষ। ক্রমে সনৎদার সাথে আমার সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে থাকে। সনৎদার আধ্যাত্মিক গান যে কত গভীর তা আমি জেনেছি। তাঁর এই গুণটার কথা অনেকেই হয়ত জানে না। সনৎদা কখনও প্রকাশ করেনি। কিন্তু আমি জানতাম। তবে সনৎদা টেলিফোনের চেয়ে পত্রালাপ করতে বেশি ভালোবাসতেন। আমার চেয়ে সনৎদা বয়সে অনেক বড়। কিন্তু সনৎদা বয়সের পরোয়া না করে মিলে গেছেন আসরের সঙ্গে, ছোট ছোট সোনারকাঠিদের সাথে।

আমি শিবিরে যেসব ছড়ার ব্যায়াম শিখেছি ও মাইনর গেমস খেলেছি সবই সনৎদাই শিখিয়েছেন। আমার প্রথম ছড়ার ব্যায়াম "থুরথুর বুড়ি" তা তো ওঁনারই শেখানো। উনি আমাকে ভালো করে, সুন্দর করে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এক বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সনৎদা। আমি কখনও তাঁকে রাগতে দেখিনি। প্রকৃতপক্ষে সনৎদা হলেন একজন স্থিতধী ব্যক্তি।

শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতায় আছে—

> "দুঃখেষু নু দ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগত স্পৃহ
> বিতরাগ ভয়ে ক্রোধ স্থিতধীর্মুলিচ্যতে"

সনৎদা সেইরকম একজন ব্যক্তি যাঁর দুঃখে কোন উদ্বেগ নেই, সুখে উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, ক্রোধ-ভয়-রাগ সবই তিনি জয় করেছেন। তাই তিনি স্থিতধী। সবপেয়েছির আসর থেকে সবই পাওয়া যায়। সনৎদা সবপেয়েছির আসর থেকে আনন্দ পেয়েছেন। আনন্দই হল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম লাভ করলে কিছু পাওয়ার থাকে না।

গীতাতে বলা আছে—

> "যাবান অর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে
> তাবান সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মাস্য বীজানতঃ"

আমরা কোনো পুকুরের জল পান করি, কোনো জলে স্নান করি, কোনো জলে গবাদি পশুকে স্নান করাই। কিন্তু যখন বন্যা হয় তখন বন্যার জলেই সব কাজ চলে। সবই একাকার হয়ে যায়। তেমনি আনন্দ পেলেই সবই পাওয়া যায়। সনৎদা তাও পেয়েছেন। গীতায় আছে — "কর্মানি ইব অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। গীতার এই উপদেশ যথাযথ মেনে চলতেন, কাজ করতেন কর্তব্যবোধে, কি পেলেন বা কি হারালেন তা নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন না।

আর লেখার কলেবর বাড়াচ্ছি না। সনৎদা-সনৎদাই। তাঁর তুলনা শুধু তিনি। সোনারকাঠিরা, আসরকর্মীরা তাঁকে ভালবাসেন শ্রদ্ধায়। সনৎদা ছিলেন আসরের পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রয়াণে সবপেয়েছির আসরে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কর্মীরা এগিয়ে নিয়ে চলো সংগঠনকে, সনৎদার আশীর্বাদ অবশ্যই সাথে থাকবে।

পুনঃ মুদ্রণ

সনৎদাকে নিয়ে একটা তথ্যচিত্র তৈরি করার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম

অশোক বসু

(কেন্দ্রীয় কর্মী, স.পে.আ.)

সনৎদা আমার শিক্ষাগুরু। আমার আগেও অজস্র শিষ্য ছিল সনৎদার। আমার পরেও আরও অনেক অনেক শিষ্য সনৎদা পেয়েছেন। সারাজীবন ছোটদের কল্যাণে নিবেদিত এমন একটা প্রাণ আমি আর দেখিনি। তাই আমার ইচ্ছে ছিল সনৎদাকে নিয়ে একটা তথ্যচিত্র তৈরি করার। এইরকম একটা নিবেদিত প্রাণ জীবনকে সকলের সামনে তুলে ধরতে। যেমন তেমন করে নয়। একদম পেশাদার লোকজন নিয়ে পেশাদারী একটা প্রযোজনা। আমাদের সবপেয়েছির আসরের সুবর্ণজয়ন্তী বছরে আমি উদ্‌যাপন সমিতিকে জানিয়েছিলাম যে সব পেয়েছির আসরের ৭৫ বছর নিয়ে আমি একটা তথ্যচিত্র তৈরি করব। তার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সাও আমিই জোগাড় করব। আমাদের কমিটি সেই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। আমার পরিকল্পনা ছিল সনৎদা গল্পের মতো সবপেয়েছির আসরের ইতিহাস বলে যাবেন, আর আমরা সেটা চিত্রায়ন করব এবং তার সঙ্গে অন্যান্য যেসব তথ্য বা ছবি থাকা দরকার সেগুলো যোগ করব। মুকুল সবপেয়েছির আসরের সোনালি ঘোষ, এখন দাশগুপ্ত, আমার মাসতুতো বোন অ্যাংকারিংয়ের কাজটা করবে। সোনালি জগন্নাথ বসুর কাছে আবৃত্তি শিখেছে। জগন্নাথদা, উর্মিদির—উর্মিমালা বসুরও খুব প্রিয়। ওকে খুব স্নেহ করেন ওঁরা। এখনও জগন্নাথদাদের সঙ্গে ওর নিয়মিত যোগাযোগ আছে। আর সবপেয়েছির আসরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ছবি ও ভিডিও সব জোগাড় করে দেবে আমাদের খায়রোজ মণ্ডল।

শেষ জীবনে উত্তর কলকাতার বাস তুলে দিয়ে সনৎদা দক্ষিণের কুঁদঘাটে চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নিয়মিত মেট্রো রেলে চড়ে শ্যামবাজারে নবমিতালি আসরে আসতেন বিকেলবেলা। আসরের প্রাত্যহিক কার্যক্রম শেষ করে আবার সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে যেতেন। আমার ইচ্ছে ছিল সবপেয়েছির আসরের ইতিহাস যেমন সনৎদা বলে যাবেন, তেমনই সনৎদার সঙ্গে আরও অনেক ব্যাপার জড়িয়ে আছে। সবই শিশু ও কিশোরদের কল্যাণের জন্য। সেই সমস্ত বিষয়গুলি জুড়ে আলাদা করে সনৎদাকে নিয়ে আর একটা তথ্যচিত্র তৈরি করব। যেখানে সনৎদা একজন শিশু ও কিশোর দরদী মানুষ। সারাটা জীবন যিনি এদের জন্যই দিয়ে গিয়েছেন।

সনৎদার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সনৎদা রাজিও ছিলেন। কেন্দ্রীয় কর্মীদের আরও অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছিলাম। সবাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। মেট্রো রেলে শ্যুটিং করার জন্য বিশেষ অনুমতি দরকার হয়। এ ব্যাপারে একজনকে কাজে লাগিয়েছিলাম। তিনি কাজ খানিকটা এগিয়ে ছিলেনও। কথা ছিল একটা অ্যাপলিকেশন করে নিয়ে আমি মেট্রো রেলের পাবলিক রিলেশনস অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ভেবেছিলাম—সনৎদা কুঁদঘাট থেকে মেট্রো রেলে উঠছেন। তারপর মেট্রো রেলের সিটে বসেই বলতে বলতে চলেছেন এবং সবশেষে মেট্রো থেকে নেমে পৌঁছচ্ছেন আসরের মাঠে। মাঝখানে যা কিছু। করোনার জন্য কাজটা থমকে গেল। টাকা-পয়সা যাদের দেওয়ার কথা ছিল তারাও একটু হাত গুটিয়ে নিলেন। তবে ঠিক করেছিলাম, করোনার পর্বটা চুকে গেলে কাজটা করব। কিন্তু সনৎদাই সেই কাজটা আর করতে দিলেন না। হুট্ করে চলে গেলেন। যথেষ্ট বয়স হয়েছিল সনৎদার। কিন্তু এই বয়সেও সনৎদা যতখানি তরুণ ছিলেন, আমি তো ততখানি নইই, আমাদের তরুণও ততখানি তরুণ কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই ভেবেছিলাম হয়ত আমার ইচ্ছেটা পূরণ হবে। কিন্তু হল না।

গুরু ব্রহ্মা

শ্রুতি ঘোষ

(প্রাক্তন প্রশিক্ষক, পুরুলিয়া)

হঠাৎ একটা ফোন। ফোনের ওপ্রান্ত থেকে ছোটন (পুরুলিয়া অঞ্চলের সংগঠক শ্রী অনুপ নিয়োগীর ভাইপো) বলছে .... 'কেয়া দি কোথায় আছো? সনৎ দা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। তুমি কি আসতে পারবে একবার দেখা করতে? সনৎদা রা হোটেল তিরুপতি প্লাজাতে উঠেছে। কি শুনছি? নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি। এতটাই বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম ঘটনার আকস্মিকতায় যে আমার বাড়ির সামনেই হোটেলটি অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আমি ছোটনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় রে হোটেলটা?" প্রথম প্রেমের (সব পেয়েছির আসর) মায়া ছেড়ে এসে আর পাঁচটা মেয়ের মত আমিও তখন শারীরিক, মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে একটু একটু করে মানিয়ে নিচ্ছি। সনৎ দা'র সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারবো না? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেলে ও আমি রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘটনাটা আজ থেকে চার-পাঁচ বছর আগেকার। সনৎ দা-রা অনেক জন মিলে এসেছিলেন হোলির ছুটিতে পুরুলিয়া ভ্রমণে। নিজের পাশে আমাকে আর ছেলেকে বসিয়ে কত গল্প করলেন। বোনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিভাবে বাবার হঠাৎ করে ওরকম হয়ে গেল জানতে চাইলেন। মা কোথায় থাকে? আরো অনেক ব্যক্তিগত গল্প। ক্যাম্পে দেখা সনৎ দা-র সঙ্গে এই সনৎ দা'কে একদমই মেলাতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল যেন আমার নিজের জেঠু আমার মাথায় হাত রেখে আমাকে সান্তনা দিচ্ছে, "আমি তো আছি"। ছেলেকে বললেন, "আমি তোমার দাদু হই, তোমাকে অনেক মজার মজার ছড়া শিখিয়ে দেব"। আরো একটু পুরনো ঘটনা। সালটা ২০০৩। প্রতিবছর আমাদের আসরের (পুরলিয়া তরণ সংঘ সব পেয়েছির আসর) বার্ষিক অনুষ্ঠান হত এপ্রিল মাস নাগাদ। দু'দিনের অনুষ্ঠান তাই রিহার্সাল শুরু হয়ে যেত অনেকদিন আগে থেকেই। অনুষ্ঠানের জন্য তো একটা উন্মাদনা থাকতোই, তবে আরেকটা উত্তেজনা থাকতো এটা জানার জন্য যে এবার মূলকেন্দ্র থেকে কে আসবে? এবার আমরা জানতে পারলাম যে এবার সনৎদা আসছেন। এটা জানার পর থেকে আমাদের যে কি আনন্দ, কি উপলব্ধি সেটা ভাষায় প্রকাশ করে উঠতে পারবো না। ক্যাম্পে দূর থেকে দেখেছি সনৎদা'কে। সনৎ দা মানে তো আমাদের কাছে একটা ফ্যান্টাসি। সনৎ দা এলেন। দাদার থাকার ব্যবস্থা হল আমাদের বাড়িতে। পুরোটা যেন একটা স্বপ্ন। "সনৎ দা, মা জিজ্ঞাসা করছে জলখাবারে কি খাবেন?"। "একটা বাটিতে একটু মুড়ি আর শসা। ব্যাস আর কিচ্ছু লাগবে না, মাকে বলে দাও"। একজন অসাধারণ মানুষ কতটা সাধারণ হতে পারে!!! প্রথম দিনের অনুষ্ঠান বৃষ্টির জন্য পিছিয়ে গেছিল। পরের দিন সকালে উঠে আসরে গিয়ে রিহার্সাল করে ঘরে আসার পর জলখাবার খেয়ে আমাদের বাড়ির একটা ফাঁকা ঘরে শুরু হলো সনৎ দার'র কাছে ট্রেনিং। বিষয় ব্রতচারী। প্রথম প্রথম তো বেশ উৎসাহের সঙ্গেই শুরু করলাম কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীর আর মন দুই-ই অধৈর্য হয়ে পড়ল ... সনৎ দা'র কিন্তু কোন ক্লান্তি নেই। তিনি বারবার বিরক্তিহীনভাবে আমাদের অভ্যাস করিয়ে যাচ্ছেন। তাই তো আজও যেন স্পষ্টভাবে সনৎ দা'র গলার "আইসো রে মদিনা... লুক গলায় গলায় ..." শুনতে পাই। দাদাকে দেখে যে শুধু আমরা শিখেছি তাই নয়, আমাদের বাড়ির প্রতিটি মানুষ দাদাকে দেখে অনুপ্রাণিত। আমার ঠাকুমাকে তো শুনেছি অনেকদিন পর্যন্ত দাদুকে বলেছে, "তোমার শুধু রোগ রোগ। দেখলে ওই ভদ্রলোককে"। সনৎ দা'র শেখানো ছড়া, লোকনৃত্য, ব্রতচারী শুধুমাত্র নয় সনৎ দা'র পুরো জীবনযাত্রাটাই শিক্ষণীয়। প্রতিটি পদক্ষেপে সনৎ দা ছড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষার মণিমুক্ত। আমরা সেটা কতটা কুঁড়িয়ে নিতে পেরেছি বা পারছি সেটা পুরোটাই নির্ভর করছে আমাদের উপর। তোমার নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে তোমার জীবনের ব্যাপকতা, সার্থকতা। "হে সনৎ, হে ব্রহ্মা তোমার চরণে শত কোটি প্রণাম"।

সনৎ হেঁসেলে হরিণছানা

তপতী মণ্ডল

(শিক্ষিকা ও শিশুমননের লেখিকা)

আপনমনে বনের মাঝে
খেলছিল এক হরিণশিশু
মায়ের কাছে আদর খেয়ে
ঘুরছে দেখি যেদিক খুশি।

প্রজাপতির ঝাঁক দেখে সে
লাফিয়ে গেল ধরতে
ধরা তো নয় মুখের কথা
মুখ থুবড়ে পেল ব্যথা।

অনেক কষ্টে সোজা হয়ে
এদিক ওদিক তাকায় ঘুরে
মা যে কোথায় হারিয়ে গেল
ভাবছে বুঝি দাঁড়িয়ে দূরে।

মা-ও কেমন হন্যে হয়ে
খুঁজছে সোনার শিশুটিরে
জঙ্গলে যে কত্ত ভয়
জানে না সে এক্কেবারেই।

ঝোপের মাঝে লুকিয়ে ছিল
ধূর্ত এক শিয়ালছানা
ছোট্টো হরিণ দেখেই তাকে
ডাকল নিজের চোখ ইশারায়।

দিশেহারা হরিণছানা
মনে মনে ভাবল বুঝি—
মাকে এবার পাবেই পাবে
বন্ধু ঠিকই দেবে খুঁজি।

ধূর্ত পিতার ধূর্ত ছানা
কী যেন সব বোঝায় তাকে
হরিণছানা শিয়াল সাথে
কোথায় যেন যাচ্ছে হেঁটে।

বন থেকে তো অনেক দূরে
আনল শিয়াল হরিণটিরে,
গাছের তলে জিরিয়ে নিয়ে
বলল ধীরে — 'খাবো তোরে'।

হরিণছানা ভীত হয়ে
তাকিয়ে দেখে চারিধারে,
কে বাঁচাবে এই সময়ে
মা যে তার গেছে হারিয়ে।

ছোট্টো হলেও বুদ্ধি রাখে
শিয়ালভায়া বন্ধু নয় যে
ভীষণ জোরে ছুট্ লাগিয়ে
ঢুকলো কাছের হেঁসেল ঘরে।

গিন্নি মা তো অবাক হয়ে
তুলল কোলে অতিথিরে,
বাড়ির সবাই ভীষণ খুশি
দেখে স্বর্ণকান্তি হরিণশিশু।

হঠাৎ মায়ের গলা শুনে
চমকে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে
এক লাফে সে ছুটে এসে
মায়ের মুখে মুখ রাখে।

শিয়ালছানা ভাবল বসে—
এগোলে আর বাড়বে বিপদ
বুদ্ধিখানা ভেস্তে দিল
ঐ যে ছোট্টো হলদে আপদ।।

এই গল্পেও সনৎ বুড়ো।
আছেন নাকি কোনোখানে?
হ্যাঁগো ভায়া, আছেন তিনি
শিশুমনের কৌতূহলে—
কত মায়ের আপন কোনে
সোনার ছেলে কিংবা মেয়ে
বিপথ না হয় এমন ভেবে,
আরও একটি সনৎ বুড়োর আশায় বসে
আছেন চেয়ে—
বুকে যিনি নেবেন টেনে!!

সনৎদা ও আসর

প্রভঞ্জন সরকার

(প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কর্মী)

সবপেয়েছির আসর মাঝে তোমার স্মৃতি স্মরণ,
রইবে চিরকাল সবার মাঝে থাকবে অনুক্ষণ।
শিশুদের প্রতি ভালোবাসা সারা জীবন ধরি,
রইলে তুমি চিরকাল এই প্রতিজ্ঞা করি।
মানুষ গড়ার ব্রত ছিল তোমার ধ্যান ও জ্ঞান,
সবপেয়েছির আসর মাঝে বাড়াবে তার মান।
বাংলাদেশের শিশু-কিশোর তোমাকে পেয়ে ধন্য,
সেই কারণেই আসর মাঝে ছিলে যে অনন্য।
সারা জীবন করলে সেবা সব শিশুদের মাঝে,
স্মৃতির পরশ ছুঁয়ে যাবে নানারকম কাজে।
আসর মাঝে তুমি হলে মোদের ধ্রুবতারা,
সকলসময় পাই যেন মোরা সকল কাজে সারা।
হাসিখুশি জ্ঞানের আলোয় থেকো চিরকাল,
তোমার আলোয় আলোকিত প্রতিটি সকাল।
তোমার চলন, তোমার বলন, তোমার সকল আশা,
সবকিছু তার ফুটছে আজি, হয়ে নীরব ভাষা।
সবপেয়েছির জগৎ মাঝে তুমি যে বরেণ্য
আপন গুণে থাকবে বেঁচে তুমি হে প্রণম্য।।

প্রিয় সনৎদা

রাজকুমার দাস

(প্রশিক্ষক, মূলকেন্দ্র)

এক যে ছিল ছোট্ট দাদা
নামটি বলছি না
ব্যাগ থেকে পেয়ারা, লজেন্স বের করে
বলতেন এই নে এটা খা।
বলতো দাদাটি কে?
আমাদের ....!
অনেক কিছু গুণ ছিল তার
জানতেন অনেক কিছু
শিশুদের সাথে মিশে গিয়ে সে,
নিজেও হতেন শিশু
বলতো দাদাটি কে?
আমাদের ....!

মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন
মিষ্টি মিষ্টি ছড়া,
রাগতে তাঁকে দেখিনি তো
ক্লাস নেওয়া ছাড়া।
এবার বলতো দাদাটি কে?
আমাদের ....!

দাদার কথা যতই বলবো....
শেষ হবে না বলা,
জন্ম তাঁর ২০শে জানুয়ারি ১৯৩৩
প্রয়াণ ৩রা মে ২০২২ ব্যথা ভরা
এবার বলতো প্রিয় দাদাটি কে?
হ্যাঁ, ঠিক বলেছো—
আমাদের প্রিয় সনৎদাদা।।

সনৎদার স্মরণে

সমর্পিতা নিয়োগী

(সোনারকাঠি বোন, তরুণ সংঘ স.পে.আ., বরাবাজার, পুরুলিয়া)

বয়স হলেও সদাই শিশু
মোদের সনৎ দাদা,
সহজ সরল মানুষ তিনি
মনটি বড়ই সাদা।
ব্রতচারীর গুরু তিনি
ছড়ার তিনি রাজা,
সবুজ মনের মানুষ তিনি
মনটি সদাই তাজা।

সকল শিশুর বন্ধু তিনি
সবার সাথেই সখ্য,
আসর কাজে সবার মাঝে
রাখেন তিনি ঐক্য।
প্রণাম তোমায় জানাই আমি
আবার এসো ভবে,
মোদের মাঝে তোমার কীর্ত্তি
অমর হয়ে রবে।

আমাদের চোখে সনৎদা

নবমিতালি আসরের সোনারকাঠি কর্মীরা

সনৎ খুড়ো

আদিত্য ঘোষ

(নবমিতালি আসরের সোনারকাঠি-কর্মীরা)

দেশপ্রেমি অখিল নিয়োগী
যার নাম স্বপনবুড়ো
বান্ধব ছিল তাঁর এক জনা
তিনি মোদের সনৎ খুড়ো।
খুড়ো ছিলেন মানুষ ভালো
বড্ড বেশি খেয়ালি
ছোটো বড়ো সবার সনে
জমতো তাঁর হেঁয়ালি।
ভালোবাসতেন ছড়া লিখতে
সঙ্গে মজার ভঙ্গি
সোনারকাঠির ছিলেন তিনি
নিত্যদিনের সঙ্গী।
চলে গেলেন ওই পরপারের
সবপেয়েছির দেশে
তারার মাঝে নিলেন বাস
মোদের ভালোবেসে।।

দাদার আশিস

শিবম দেওয়ান

সনৎ দা মোরে শিখিয়েছিলেন
প্রথম কবিতা বলা
সনৎদাই শিখিয়েছিলেন
খেলাধুলোর আরেক নাম
জীবনে পথ চলা।
সনৎদাকে রাখবো ধরে
সারাটা জীবন
দাদার আশিস মাথায় নিয়ে
পাঠে দেবো মন।।

পিতৃতুল্য

শম্পা বসু

সনৎদা ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। আমাদের পরিবারে আর্থিক সমস্যা ছিল। সনৎদা আপনজনের মতো সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আসরে কাশ্মীর ভ্রমণ। সনৎদা নিজের পকেট থেকে দু'শ টাকা বের করে আসরে জমা দিয়ে বললেন শম্পার মা পাঠিয়েছেন। আমি মহানন্দে কাশ্মীর গেলাম। বিয়ের সময় হাতিবাগানে আমাকে নিয়ে গিয়ে স্যুটকেশ কিনে দিয়েছিলেন। শুধু আমাকে না— আসরের দুঃস্থ ভাইবোনদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। কেউ জানতে পারতো না।

স্বজনহারা নবমিতালি

কৌস্তভ মাঝি

জন্ম শ্রীপঞ্চমীতে। আর প্রয়াণ অক্ষয় তৃতীয়ায়। ধর্মপ্রাণ মানুষদের কাছে দুটোই পুণ্যদিন। যার কথা বলছি তিনি আমাদের সকলের প্রিয় সনৎ ভট্টাচার্য। আমাদের দেখা এক অনন্য মানুষ, যিনি অন্যের জন্য বিলিয়ে দিতে পারেন নিজের সর্বস্ব। ভালোবাসতেন সবাইকে, বিশেষ করে শিশুদের। তাই সবপেয়েছির বিশাল জগতে তিনি অনন্য সনৎদা। টানা ৭৪ বছর তিনি যুক্ত ছিলেন সবপেয়েছির আসরে। নিজের জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, ভালোবাসা বিলিয়ে দিয়েছেন শিশুদের মধ্যে। বাগবাজার নিবেদিতা আসরে ছিলেন সোনারকাঠি। নবমিতালি সবপেয়েছির আসরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অন্য দুজন বেণুগোপাল ও রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়। আদরের গুরু ছিলেন দাদাভাই —অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্তী।

ব্রতচারী, খো-খো, লাঠিখেলা ইত্যাদির প্রচার-প্রসারে তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। বয়সের ভার ও করোনা ভীতি গত দু'বছর সনৎদাকে গৃহবন্দি করে রাখে এবং অসুখ-বিসুখে ধরে যায়। পরিণত বয়সে হলেও তাঁর এ মৃত্যু সবপেয়েছির আসরে বিরাট শূন্যতা তৈরি করেছে। নবমিতালি আসর পরিবার হারিয়েছে সবচেয়ে প্রিয় অভিভাবককে। এই কেন্দ্রের প্রকৃত পথ প্রদর্শককে।

তুমি রবে নীরবে

কৌশানী ঘোষাল

অক্ষয় তৃতীয়ার ক্ষণটা শুরু হল অন্যভাবে। মা ঘুম থেকে তুলে বললেন সনৎদা আর নেই। প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি বললে ভুল হবে। আসলে এমনটা হবে ভাবতে পারিনি। এত শিশুপ্রিয় সনৎদা নেই তা কী করে হবে!

আসরে ভর্তি হলাম ২০১৯-এ। সনৎদাকে চিনলাম। জানলামও। যত সময় গেছে অবাক হয়ে দেখেছি একজন অশীতিপর মানুষ কিভাবে অবলীলায় ছোটাছুটি করছে, খেলে, নেচে, গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখছে। আমাদের মনে হয় সনৎদা নামের মানুষটা থামতে জানেন না, পারেন না। তাই আজ তাঁর এই বিদায়—বহতা নদীর জীবনে হঠাৎ ছন্দপতনের দিন। এটা আমাদের কাছে অনাকাঙ্খিত। সনৎদাকে চোখে দেখা না গেলেও তাঁর সৌরভ থাকবে চিরদিন।

প্রিয় দাদা

অভিরূপ আশ

সনৎদা আজ আমাদের মধ্যে নেই, তাই আমাদের সবার মন খারাপ। আমরা সবাই ভালোবাসতাম সনৎদাকে। ছড়া করতেন মজা করে, রকমারি ড্রিল আর মজার সব খেলা। গান গাইতেন, গল্প বলতেন। বেশ সুন্দর সব গল্প। একবার আমার জন্মদিনে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেদিন সবাই খুব আনন্দ করেছিলাম। কত গল্প বলেছিলেন। দোলে আমাদের দেশের বাড়ি যাবেন বলেছিলেন। সে যাওয়া আর হল না।

নিবেদন

সনৎ ভট্টাচার্য-র প্রয়াণে অভিভাবকহীন হয়েছে নবমিতালি আসর পরিবার। সমগ্র সবপেয়েছির আসরে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। টানা ৭৪ বছর স্বেচ্ছাশ্রম ও আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মানুষ গড়ার এই অনন্য কারিগর। তাঁর প্রতি নিরন্তর ও অন্তহীন শ্রদ্ধা এবং শেষ নমস্কার।।

— *অনুগত কর্মী* **সব্যসাচী চৌধুরী**

সনৎদা স্মরণে

শালিনী মিত্র

আসরে ভর্তি হয়েছি বছর পাঁচ আগে। এরমধ্যেই আপন হয়ে গেছেন সর্বত্যাগী মানুষটি। প্রতিদিন বিকেলে আমাদের সঙ্গে সময় কাটাতেন আসর মাঠে। আমাদের সমস্ত উৎসাহ প্রেরণা ছিলেন প্রাণবন্ত প্রবীণ সনৎদা। আসরের উৎসব-অনুষ্ঠান হলে নিজে হাতে লিখে বাছাই করা কবিতা এনে আমাদের শেখাতেন। এভাবেই সোনারকাঠি ভাইবোনেরা আবৃত্তি করার সুযোগ পেত। বাগবাজার থেকে বাড়ি বদল করার পর প্রতিদিন দঃ কলকাতা থেকে ছুটে আসতেন উঃ কলকাতার শ্যামবাজারে। দেশবন্ধু পার্কের আসর মাঠ ছিল তাঁর প্রাণ। প্রতি বছর সরস্বতী পুজোর সময় তাঁর জন্মদিন হত আসরে—সবাই আনন্দ ভোজনে অংশ নিত। অসুস্থ হবার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আসরে এসেছিলেন। সেদিন আমায় চিনতে পেরেছিলেন। এটাই শেষ স্মৃতি হয়ে রইল।

ছড়ার রাজা

কিংশুক শেঠ

সনৎদা নামটা শুনলেই মনে পড়ে এক অতুলনীয় ব্যক্তির নাম। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও সম্পর্ক এই নবমিতালি আসরের মাধ্যমে। কবিতা আবৃত্তির বিষয়টি আমার খুব পছন্দের। সনৎদার হাত ধরেই আমি আবৃত্তি করা শুরু করি। আসরের উৎসবে সনৎদা-ই আবৃত্তি করতে উৎসাহিত করতেন। কবিতা বাছাই করে দিতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কত কবিতা এভাবে শিখেছি।

আসর মাঠে আমাদের ছড়া, ব্যায়াম শেখানো হয়। তার বেশিরভাগ সনৎদা শেখাতেন। পরে জেনেছি ছড়া সংগ্রহ করতেন, ভঙ্গি তৈরি করতেন।দরকার পড়লে নিজেই ছড়া তৈরি করতেন। আসরের অন্য দাদাদের ছড়া বানাতে উৎসাহিত করা ছিল তাঁর নেশা। আমরা অবাক হয়ে যেতাম দাদুর বয়সি একজন মানুষ কি সুন্দর হেসে খেলে আনন্দ করছেন, আবার এর মধ্যে শরীর গড়তে অনুপ্রাণিত করতেন। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় সনৎদা ছিলেন ছড়ার রাজা।

প্রাণ ভোমরা

জয়জিৎ পাল

নবমিতালি আসর ছিল সনৎদার প্রাণভোমরা। আমরা জানি দাদা নবমিতালি ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন না।

শরীরটা চলে গেছে—না ফেরার দেশে, কিন্তু তাঁর মনটা দেশবন্ধু পার্ক ছেড়ে কোথাও যাবে না। ভাইবোনেদের সবার মন খারাপ, সনৎদাকে দেখতে পাবে না বলে। লজেন্স আর কেউ দেবে না দাদার মতো ভালোবেসে। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে নিজের হাতে এটা-ওটা বানিয়ে আসরে নিয়ে আসতেন, আমাদের খাওয়াতেন। সবার সঙ্গে তাঁর ছিল মধুর সম্পর্ক। বাঁশি বাজাতে শেখাতেন। আমি শিখেও গেছি। কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল তাঁকে বাঁশি শোনাতে পারিনি।

ভালো মানুষ সনৎদা

অঙ্কিত রায়

প্রথমেই বলি, আমাদের সনৎদা ছিলেন খুব ভালোমানুষ। ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার। নবমিতালি আসর আর সনৎদা দু'টি নাম একসঙ্গেই বলা হয়। তিনি শুধু আসর প্রতিষ্ঠাই করেননি, আগলে রেখেছিলেন টানা ৬৭ বছর। গত দু'বছর করোনার জন্য আসতে পারেননি—তবে নিয়মিত খোঁজ খবর নিতেন। আমাদের কর্মীদাদারা ও আমরা ছোটোরা তাঁর কুঁদঘাটের বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছি। নিজে সংসার করেননি, তবে আসরের ভাই-বোনেরা ছিল তাঁর নয়নের মণি। তাঁকে হারিয়ে আমরা কষ্ট পাচ্ছি।

সঙ্কট নিয়েও সংগঠন এগিয়েছে নতুন কদমে

সনৎ ভট্টাচার্য

ষাট সত্তরের মধ্য পর্যন্ত এক দশকের সবপেয়েছির আসরের সার্বিক মূল্যায়ন করতে বসলে বহু ঘটনার ছবি স্মৃতির আলোকে আজ ভেসে ওঠে। এই দশক ছিল একদিকে সংগঠনের বহু সমস্যা অপরদিকে ছিল তার সমাধান ও সংগঠনের ব্যাপক বিস্তৃতি। সবপেয়েছির আসরের প্রথম যুগে (১৯৪৫-৬০) যাঁরা ছিলেন মুখ্য ভূমিকায় তাঁদের একটি গরিষ্ঠ অংশ স্বপনবুড়োর সঙ্গে তুচ্ছ অভিমান করে একযোগে ১৯৬২ সালের গোড়ায় সংগঠন ছেড়ে চলে গেলেন এবং 'বসুমতী' পত্রিকার সহযোগিতায় পাল্টা শিশু সংগঠন গড়ে তুলে আমাদের সংগঠনকে দাঁড় করাল এক চ্যালেঞ্জের মুখে। স্বপনবুড়ো আমাদের পরিচালক হলেও মাঠে-ঘাটে নেমে সংগঠন করতে হলে তো নিষ্ঠাবান ও পরীক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। কিছুটা শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় কর্মী পাওয়া যাবে তো? কিন্তু মূলকেন্দ্রের আহ্বানে আমরা পেলাম নূতন কিছু তরুণ কর্মী যারা ঐ সঙ্কটকালে সংগঠনে যুক্ত থাকা বাকি পুরানো কর্মীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সংগঠনকে মজবুত ও প্রসার করতে ব্রতী হলেন। নূতন কর্মী তালিকায় প্রথমে পেলাম অনিল চ্যাটার্জি, প্রদীপ রায়, পরেশ দত্তকে। বোনেদের মধ্যে অঞ্জনা দাশগুপ্ত ভাল কাজ করতে লাগল। সংগঠনের কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগল। এরই জোয়ারে ১৯৬৫ সালে বার্ষিক শিবির বসল বিষ্ণুপুরে রামানন্দ কলেজে। শিক্ষার্থী সংখ্যা কম থাকলেও উৎসাহের ঘাটতি ছিল না। শিবিরের মধ্যে সরকারি আহ্বানে স্থানীয় কৃষিমেলায় অনুষ্ঠান করা হল। 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ' পালায় অনিলদার কুম্ভকর্ণের ভূমিকা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। এইভাবেই চিত্তরঞ্জন, ভুবনেশ্বর, হরিশচন্দ্রপুর, বেনারস প্রভৃতি বঙ্গে ও বহির্বঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে শিবির অনুষ্ঠিত হল। অনেকদিন বাসনা ছিল যে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বার্ষিক শিবিরের আয়োজন করা। ১৯৭২ সালে সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। সে বছর মে মাসে দিল্লিতে গোল মার্কেটের কাছে বাঙালি স্কুলে সেই শিবির অনুষ্ঠিত হলো। সবপেয়েছির আসরের সমস্ত শাখা আসর থেকে দক্ষ সোনারকাঠিরা অংশগ্রহণ করল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে দিল্লিতে আমরা তেমন সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হলাম। প্রায় দর্শকবিহীন ময়দানে আমাদের শিবিরের সমাপ্তি উৎসব সম্পন্ন হল। তবে সে বছর পুজোর ছুটিতে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম কর্মী শিক্ষাশিবির অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। দুর্গাপুরের আসরদের আন্তরিকতায় শিবিরের প্রচার ও প্রদর্শনী খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। এই শিবির থেকেই আমরা কবিয়াল সোমেশ ভুঁইএঞা ও কর্মবীর জয়ন্ত দেশমুখ্যকে এবং প্রতিভাময়ী বোনকর্মী মিনু ভট্টাচার্য ও তমসা চক্রবর্তীকে মূলকেন্দ্রে পেলাম। তারও আগে ১৯৬৯ সালে বহরমপুর শিবিরে আগত এক শিক্ষার্থীর ভিতর আমরা সংগঠক প্রতিভাকে আবিষ্কার করলাম। কর্মীটি বর্তমানে সকলের প্রিয় অপূর্ব গাঙ্গুলি, যিনি বর্তমানে সবপেয়েছির আসরের স্থপতি। এছাড়া এই দশকে কর্মী ও প্রশিক্ষক রূপে পেলাম স্বপন চক্রবর্তী, প্রদীপ চক্রবর্তী, তপন বসু, গোপাল আইচ, সজল চন্দ, মিহির মুখার্জি, মৃণাল ব্যনার্জিকে। আরও কর্মী এসেছিলেন। এদের অবদানে সংগঠনের সুনাম ও স্থায়িত্ব সুদৃঢ় হয়েছিল। আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই যিনি ভ্রাম্যমান সংগঠকরূপে দুর্গাপুরে বিরাট আসর সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, তাঁকে এক সময় কিছু ঈর্ষান্বিত কর্মীর প্ররোচনায় মূলকেন্দ্র থেকে সরে যেতে হয়েছিল। তিনিও ১৯৭২ সালে কর্মীশিবিরে স্বপনবুড়োর ও সকলের আহ্বানে মূলকেন্দ্রে ফিরে এলেন। আজও এই অতিবৃদ্ধ মাস্টারমশাই আমাদের সকল কাজের সঙ্গী এবং তাঁর পরামর্শ আমাদের চলার পথের পাথেয়। এইভাবে ১৯৬৫ সালের থেকে সংগঠন উত্তরোত্তর সুনামের সঙ্গে এগিয়ে চললো। একদিকে জেলায় জেলায় সংগঠনের বিস্তার অপর দিকে নূতন নূতন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক চর্চা চলতে লাগলো। মহাজাতি সদনে, নেতাজি

মঞ্চে ৫-৭দিন ব্যাপী শিশুমেলা ও প্রদর্শনী তারই স্বাক্ষর বহন করে। জাতীয় খেলাধূলাতে সবপেয়েছির আসর পথিকৃতের ভূমিকা নিল। অখ্যাত জাতীয় খেলা খো-খো কে বাংলার বুকে সবপেয়েছির আসরই ক্রীড়াজগতের সামনে তুলে ধরল। সবপেয়েছির আসর থেকেই সর্বপ্রথম বাংলায় খো-খো খেলার নিয়মকানুন সংগঠনীতে প্রকাশিত হল। ১৯৬৭ সাল থেকে আসরের খেলোয়াড়রা জাতীয় খো-খো খেলার নিয়মকানুন সংগঠনীতে প্রকাশিত হল। ১৯৬৭ সাল থেকে আসরের খেলোয়াড়রা জাতীয় খো-খো খেলা অংশগ্রহণ করলেও সঠিক পদ্ধতিতে খো-খো খেলা জানা ছিল না। ১৯৭১ সালে আমাদের প্রেরণায় প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড় ও আসরকর্মী প্রণব রায় সর্বপ্রথম পাতিয়ালায় গিয়ে খো-খো-তে এন.আই.এস. কোচিং নিয়ে এলো এবং সে বছরই তারই প্রচেষ্টায় সঠিক পদ্ধতিতে পশ্চিমবাংলায় প্রথম খো-খো প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। তারই ফলশ্রুতিতে আজ খো-খো জগতে পশ্চিমবাংলার স্থান অতি উচ্চে। আমাদের সংগঠন থেকেই আমি ও অন্য দুজন কর্মী প্রভাস ঘোষ ও অমিয় ঠাকুর প্রথম সর্বভারতীয় খো-খো রেফারি পরীক্ষায় পাশ করি। প্রভাস রায় বর্তমানে সর্বভারতীয় খো-খো রেফারিগণের মধ্যে অন্যতম।

এইসব শিশু-কিশোর উপযোগী শিক্ষণসূচি প্রবর্তনের ফলে জেলায় জেলায় সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটলো। ফলে মূলকেন্দ্র থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমগ্র আসর সংগঠন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তাই এই দশকেই সংগঠনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে নানা অঞ্চল ও উপঅঞ্চলে ভাগ করে অঞ্চলের নিষ্ঠাবান কর্মীদের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হল সেই সেই অঞ্চলের শাখা আসরদের দেখভাল করার জন্য। সৃষ্টি হল সংগঠক ও প্রশিক্ষক পদ।

সবপেয়েছির আসরে স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করার বাসনা বহুদিন ছিল। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছিল না। ষাটের যুগে সে সুযোগ এল। তখন ভ্রাম্যমান সংগঠক ছিলেন সকলের প্রিয় প্রয়াত সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। সুধাংশুদা যেমন ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল তেমনি কর্মপটু। তাঁরই প্রচেষ্টায় হালিশহরের কাছে মাদারিপুর গ্রামে গ্রামবাসীদের বদান্যতায় সবপেয়েছির আসরের গ্রাম্য শিশুভবন ও অন্যান্য প্রকল্প গড়ার উদ্দেশ্যে ছয় বিঘা জমি পাওয়া যায়। স্বপনবুড়োর উপস্থিতি ও জননেতা প্রফুল্ল সেনের উদ্বোধনের মাধ্যমে শিশুভবন গড়ে ওঠে। সেখানে শিশুভবন প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোস্টঅফিস, খেলার মাঠ স্থাপিত হয়। আরও বহু উন্নয়ন-পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবাংলায় সত্তরের দশকের প্রথমে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ঐখানে থেকে কাজ করার জন্য নিষ্ঠাবান কর্মী না পাওয়াতে অচিরেই ঐ প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাস মাইনে পেলেন না। তাঁরা আশায় আশায় বেশ কয়েক বছর তবু বিদ্যালয় চালিয়েছিলেন। পরে তাও বন্ধ হয়ে গেল। বহু বছর বাদে আশির দশকে ঐ শিশুভবন পুনরুদ্ধার করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে ঐ শিশুভবন ও জমি ত্যাগ করতে হয়েছে।

ষাট-সত্তরের দশক সবপেয়েছির আসরের সংগঠন নূতন কদমে এগিয়ে চললেও সেই সময় কতকগুলি দুঃখজনক ঘটনা আমাদের সকলের মনকে বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। প্রথমেই স্বপনবুড়োর 'যুগান্তর' পত্রিকা থেকে অবসর গ্রহণ। সংগঠনের জন্মদাতা ছিলেন তিনি, সাহায্য করেছেন 'যুগান্তর' কর্তৃপক্ষ। প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবারে 'যুগান্তর' পত্রিকার একটি পাতা আসরের কাজে ব্যবহৃত হত। এছাড়া 'যুগান্তর' থেকে নানাবিধ সাহায্য পাওয়া যেত। কিন্তু স্বপনবুড়োর আজীবন পাত্তাড়ি পরিচালক রূপে থাকার ইচ্ছা থাকলেও পত্রিকার নিয়ম মত কর্তৃপক্ষ তা মেনে নিলেন না। ফলে স্বপনবুড়ো অবসরের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন করলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালক পদ থেকেও অব্যাহতি নিলেন। ফলে আমরা প্রথমে সংগঠনের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম। তখনও আমাদের সংগঠন স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়নি। যুগান্তরের দেওয়া সকল সুবিধা নিয়েই চলছিল সংগঠন। স্বপনবুড়োর অনুপস্থিতিতে যুগান্তর কর্তৃপক্ষ কি ভূমিকা নেবেন তা অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু যুগান্তরের অন্যতম কর্ণধার শ্রদ্ধেয়

সুকমলকান্তি ঘোষের হস্তক্ষেপে আমাদের সকল দুশ্চিন্তার অবসান হয়। পাততাড়িতে আসর সংগঠনের খবর সংক্ষিপ্ত হয়ে গেলেও সকল সুবিধা রয়ে গেল। আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা হল, আমাদের সংগঠন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চললেও সত্তরের দশকে একজন কর্মী যুগান্তরের কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে মূল কমিটি ভেঙে দিয়ে এ্যাড হক্ কমিটি গঠন করে বিভেদ সৃষ্টি করেন। আর সর্বশেষে ঘটে এক অতীব দুঃখজনক ও শোকাহত ঘটনা। ভগবতীদা (ভগবতী শঙ্কর দে) ছিলেন সবপেয়েছির আসরের প্রথম যুগের এক অনলস ও নিষ্ঠাবান কর্মী। আলোকচিত্র শিল্পীরূপে তাঁর আগমন হলেও পরে সংগঠনের সকল কর্মে তাঁর ছিল অসীম উৎসাহ। বহুদিন ধরে অর্থদপ্তরে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। এছাড়া বহু সমস্যামূলক বিষয়ে তাঁর ক্ষুরবুদ্ধি ও পরামর্শ বহু জটিলতাকে দূর করেছে। তিনি ছিলেন আমাদের সংগঠনের কাছে অপরিহার্য। কিন্তু তাঁকে আমরা অকালে হারিয়েছি '৭২-এ মে মাসে। সে সময় দিল্লিতে শিবির বসেছে কিন্তু ভগবতীদা সামান্য বিষয়ে অভিমান করে শিবিরে গেলেন না। মনে হয় সেই অভিমানেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। শিবির থেকে ফিরে শুনি সেই মর্মান্তিক সংবাদ। এই দশকে বহু আনন্দের ছবি আঁকা থাকলেও এই ঘটনা আমাদের মনকে অশ্রুসিক্ত করে দিয়েছিলো।

সেদিন অঞ্চল গড়তে গিয়ে আঘাত পেয়েছি

অতুল বিশ্বাস

আমার আসানসোল অঞ্চলের কথা বলতে গিয়ে কিছু নিজের সঙ্গে সবপেয়েছির আসরে যোগদানের কথা এসে যায়। তাই সেটা দিয়েই অঞ্চলের কথায় আসি। কিছু নেশা মানুষকে তার মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে করার অনুপ্রেরণা জোগায়। আমারও এমনি এক নেশা কৈশোরের প্রারম্ভে বিদ্ধ করতে থাকে। সে নেশা ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছু করা। ফুটবল খেলতাম বলে ছেলেদের নিয়ে ফুটবল দল তৈরি করি। তারপর কাবাডি খেলি। তারপর ভাবি—সকলকে নিয়ে আর কি করা যায়? এমনি সময় যুগান্তরের পাততাড়ির পাতায় লম্বা দাড়িওয়ালা স্বপনবুড়োর চিঠিতে পাততাড়ির সভ্য হতে ডাকটিকিট পাঠিয়ে হওয়ার কথা জানি। আরও দেখি সবপেয়েছির আসরের কথা। কেমন যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। চারিদিকে খুঁজে কোন প্রতিষ্ঠিত আসর না পেয়ে একদিন কলকাতা যুগান্তর অফিসে গিয়ে স্বপনবুড়োর সঙ্গে দেখা করে, সব জেনে আসি। শুরু করি ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাটোয়াতে নেতাজি সবপেয়েছির আসর। সে ১৯৫৪ সনের কথা। কর্মকর্তা পাই অনেক। পাই দাশু ঘটককে। আমার একনিষ্ঠ পাগলা দাশুভাই মনপ্রাণ দিয়ে সংস্থায় কাজ করে। মূলকেন্দ্রের একটা ক্যাম্পও হয়ে যায় কাটোয়াতে স্থানীয় গণ্যমান্য লোকের সহযোগিতায়। এ সেই পাঁচের দশকের কথা।

আমার সেই কলেজ জীবনের পর্ব শেষ করে আমি কর্মজীবনে। চাকরি পাই সেন-র‍্যালে কোম্পানিতে। আসানসোলে নতুন সেন-র‍্যালে কারখানার আবাসনে আসর গড়ার সংকল্প নিলাম। ১৯৬১ সনের নভেম্বরে আসানসোলে প্রথম শুরু হল 'মিতালি সবপেয়েছির আসর'। সারা অঞ্চলের ছেলেমেয়ে যোগদান করল খেলাধূলায়। কোম্পানি মাঠ করে দিল খেলার মত করে। সব রকমের সহযোগিতার হাত বাড়াল কোম্পানি। একদিন মাননীয় জ্যোতি বসু মহাশয়

সোনারকাঠিদের আশীর্বাদ করে গেলেন। আকৃষ্ট হোল অনেকে। গড়ে উঠল গোপাল গুহর প্রচেষ্টায় দিঘারীতে দিঘারী আসর। শশাঙ্ক বৈদ্যর চেষ্টায় শ্রীসংঘ আসর, দেবী ব্যানার্জির চেষ্টায় অগ্রণী সংঘ, সমর ব্যানার্জির চেষ্টায় দীপান্বিতা, তাপস ব্যানার্জির নিঙ্গা বহ্নিশিখা আসর, প্রশান্ত মুখার্জির প্রেরণায় মুরাড়িতে অরুণোদয়, জামুরিয়ায় সব্যসাচী আসর। মাইথনে সুবোধ ঘোষের মাইথন আসর। শুরু হয় আসর গড়ার জোয়ার। আনন্দের কথা, সর্বক্ষেত্রে আমার গতি ছিল অবারিত। অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকি সকল স্তরে। চেষ্টা করি গোপালভাই, কমল রায়কে নিয়ে শিখতে, শেখাতে। এদের সহযোগিতায় এমন করে গড়ে ঐকতান, ব্যারেট ক্লাব, স্বরাজ, চিত্তরঞ্জন, মহিশীলা সোনালী আরও আরও অনেক আসর। আমাদের যেন আসর গড়ার নেশায় পেয়ে যায় সেদিন। আসানসোল মহকুমায় আসর করার যেন এক প্রেরণা আসে। এমনি করে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখি শুধু আসর গড়লেই চলবে না, তার সঙ্গে চাই প্রশিক্ষণে দক্ষ কর্মী ও সংযোগরক্ষাকারী কর্মীদল।

সংগঠন করি আন্তঃআসর লোকনৃত্য ও ড্রিল প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, একইসঙ্গে শিক্ষণ শ্রেণী। কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে শিক্ষণের জন্য সনৎদা, অনিলদাকে এনে শিক্ষণের ব্যবস্থা করি। এমনি করেও মনে হয় আসরের চাহিদা মেটানো যায় না। তাই সকলকে নিয়ে এই দূরাঞ্চলের চাহিদা মেটাতে সংঘবদ্ধ কর্মীদলের আর যোগাযোগ রক্ষা করতে সকলকে নিয়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করি ও রূপায়ণে হাত দিই।

একদিন স্বপনবুড়োর কাছে গিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করি। দুঃখের ব্যাপার তিনি ভীষণভাবে এ ধরণের কাজকে প্রতিহত করে, আপত্তি তোলেন। ভেঙে পড়ি সম্পূর্ণ। এর সাক্ষী থাকে পুরনো দিনের সব কর্মীরাই। দিন যায়। পরিবর্তিত সময়ে সব পেয়েছির আসরের কার্যকরী কমিটি গঠিত হলে সবপেয়েছির আসরকে উন্নত স্তরে তুলে বাঁচিয়ে রেখে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে জেলা বা অঞ্চল করার প্রস্তাব নেন। যথারীতি অঞ্চল গঠিত হয়। আসানসোলও এমনি একটি অঞ্চল হয় সারা মহকুমা নিয়ে। পুরুলিয়া শিবিরে মাষ্টারমশায়ের সুপারিশে অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয় সংগঠক ও প্রশিক্ষক গোপাল গুহকে। প্রশিক্ষক হয় কমল রায়। আমার সেদিন সবথেকে বেশি আনন্দ হয়। বাড়তে থাকে আসরের সংখ্যা। চলতে থাকে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিক্ষণ আর সাংগঠনিক তৎপরতায়। একদিন অঞ্চলের দায়িত্ব বর্তায় আমার উপর। আসর ব্যাপ্তির সঙ্গে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। দক্ষ কর্মীদের নিয়ে সহায়ক প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষকের পদ সৃষ্টি হয়। সর্বস্তরে শিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করার জন্য চারটি স্তরে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এমনি শিক্ষণ নিয়ে একে একে অঞ্চলে প্রশিক্ষক আসে মৌসুমী চ্যাটার্জি, রবিশঙ্কর পাল, রবীন্দ্রনাথ রায়, অরুণাংশু বিশ্বাস, বীণা পাল, পরিতোষ গুহ। আসে সমীর ব্যানার্জি, উমা সরকার, সৌগত রায়। অঞ্চলে আসরের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০/৪৫টি। দূর-দূরান্তের আসরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। যুগের হাওয়ায় কর্মীর অভাব ঘটতে থাকে। অনেক আসরের হয় অকাল মৃত্যু। যারা বেঁচে থাকে তাদের নিয়ে আজকে আসরের সংখ্যা দাঁড়ায় আসানসোলে ২২টি। আসরের কর্মকান্ড ও ব্যাপ্তির সঙ্গে সর্বস্তরে কি সরকারি কি বেসরকারী আজ সবপেয়েছির আসরের নাম সকলের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়।

অঞ্চলে প্রথম কেন্দ্রীয় শিবির হয় ১৯৬৫তে। দিঘারী আসরের ব্যবস্থাপনায়। দ্বিতীয়বার ওখানেই শিবির হয় ১৯৮২-তে স্মরণীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে। স্বপনবুড়ো দুটি শিবিরেই উপস্থিত থাকেন। ১৯৭৫-এ বিধানচন্দ্র কলেজে বিধানপল্লী আসরের ব্যবস্থায় কর্মীশিবির হয়। দ্বিতীয়বার ঐ কলেজে অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় হয় সোনারকাঠি শিবির ১৯৯১ সালে। পাঁচটি জেলা নিয়ে অঞ্চল শিবির হয় মহিশীলা সোনালীতে ও সিঁদুলীতে। আসরের গতি থাকে দ্রুত গতিতে সচল। কেন্দ্রের প্রতিনিয়ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করি আপ্রাণ চেষ্টায়। অঞ্চল প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতি শুক্রবার মিলনী দিবসে কাজের পর্যালোচনা করে নতুন পরিকল্পনা নিই।

এই সুবর্ণ জয়ন্তীর মধ্যে সেদিনের কর্মী-সোনারকাঠির সংমিশ্রণে যে মিলন ঘটেছে তার জন্য কর্মীদের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। এত সবের পরও কোথায় যেন একটা বেসুর তান কেবলি ঘরে ফিরে মরছে। আমরা যারা পুরানো, যাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টা নিঃশেষিত করেছি এই সংগঠনের মধ্যে, তাদের সঙ্গে বর্তমানের কর্মীর কোথায় যেন একনিষ্ঠতার, একাত্মতার অভাব ঘটেছে। সংগঠনে পাওয়ার নেশায় ধরলে দেওয়ার প্রেরণা লুপ্ত হয়। তাই ভয়ের সঙ্গে বলতে হয় মানসিক সংশোধন দরকার। সুস্থ চিন্তাধারার প্রয়োজন।

তাই আমাদের সঙ্কল্প হোক — দুষ্ট বুদ্ধির বিনাশ ঘটিয়ে শুভবুদ্ধির সূচনা। সুস্থ সমাজ জীবন গড়ে ওঠার সোপানে আমরা যেন পথ প্রদর্শক হই।

পুনঃ মুদ্রণ

যেথায় আছে শুধু ভালবাসা বাসি......

শ্রীমাষ্টার মশাই

জীবনে বহু সংগঠনের সান্নিধ্য লাভ করেছি। মিশেছি, ভালবেসেছি, সম্মান পেয়েছি। কিন্তু সংগঠনের ভালবাসা পাইনি। সরে এসেছি। একটি নীতি মেনে চলতাম। তার মাঝপথে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে একটি বড়দের ক্লাবের সামনে কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে। সেদিনটা ছিল মঙ্গলবার। কয়েকটি যুব কর্মী পতাকা তুলল এবং শপথ বাক্য পাঠ করাল। সেই শপথ বাক্যটি আমার মনের সব কয়টি চিন্তা ধারার সঙ্গে মিলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। ছেলেমেয়েদের দলগতভাবে বসিয়ে দিয়ে সাহিত্যসভা শুরু করল। আমি দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে দেখছি এমন সময় একজন বয়স্ক লোক এসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েদের সম্মুখে একটি চেয়ার দিয়ে বসতে দিলেন। আমি পুতুলের মত তাঁকে অনুসরণ করছি। একজন যুবকের নির্দেশে ছেলেমেয়েরা আমাকে অভিবাদন জানাল। আমি কিন্তু তাদের কাছে অজ্ঞাতকুশলী। আমি বলতে বাধ্য হলাম, 'আমি মুগ্ধ, আমি অভিভূত, আমি তৃপ্ত, আমি আজ সব পেয়ে গেলাম'। একজন বয়োবৃদ্ধ ক্লাবকর্মী বললেন, 'এইটিই তো সবপেয়েছির আসর'। আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একজন যুবকর্মীর ইঙ্গিতে ছোট ভাইবোনেরা সমস্বরে গান ধরল 'এরাই মোদের সবার প্রিয়'। এরপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরে যতই অন্য কাজে মন দিই কিন্তু তাদের স্মৃতি মন থেকে যায় না। সবপেয়েছির আসরের ভালবাসায় আমি ভালবেসে ফেলেছি। তাই আর সবপেয়েছির আসরকে ভোলা সম্ভবপর নয়।

দিন যায়, ক্ষণ যায়, বছর যায়। আমি সবপেয়েছির আসরের প্রতি ঘনীভূত হয়ে পড়ি। সবপেয়েছির আসরের সেবা আমার ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, মন। কোন প্রকার বহিঃ প্রকাশ না করে যেখানে গেছি সেখানেই আসর গড়ার প্রেরণা দিয়েছি। আসর গড়েছি। কেন্দ্রীয় কর্মী এমনকি স্বয়ং স্বপনবুড়োর স্বরূপ দর্শনেও করিনি কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে আমি ভালবেসে চলেছি। ১৯৫৪ সাল শান্তিপুরে বকুলবাগান সবপেয়েছির আসর গড়ি। আমি তখন শান্তিপুরে কিছুদিন ছিলাম। আত্মপ্রকাশ এখনও কাম্য নয়। তারপর কলকাতায় কালীঘাট আসর, পরে চেতলা আসরই আমাকে সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করে। তখন চিত্তরঞ্জন নর্থ ও সাউথ কলোনিতে আসর গড়ি।

১৯৫৮ সালে ২৬ জানুয়ারি ব্রিগেড গ্রাউণ্ডে আসর নিয়ে যোগদান। ১৯৫৯ সালে চেতলা আসরের গুণীজন সম্বর্ধনায় মহাজাতি সদনে গুণীজনদের মধ্যে আমাকেও মঞ্চে স্থান করে দেন। মঞ্চে ছিলেন শ্রদ্ধেয় স্বপনবুড়ো, কুমার বাহাদুর বীরেন্দ্র কিশোর, মহামান্য রায়চাঁদ বড়াল, মাননীয় মোহিনী মিশ্র, সরজুবালা, প্রেমলতা দেব এবং তাঁদের সঙ্গে আমি। সেই সময়ে পরম স্নেহাস্পদ সনৎ ভট্টাচার্য এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন। সেই সময় আমার ছিল লম্বা চুল, দাড়ি এবং চোখে চশমা, স্বপনবুড়ো বললেন এখন মাষ্টারমশাই স্বপনবুড়ো হয়েছেন। কারণ পাত্তাড়িতে স্বপনবুড়োর প্রতীক ছবি ঐরকম ছিল। তাই অনেক লোকে আমাকে স্বপনবুড়ো ভাবতেন। এই কথার পরদিনই চুলদাড়ি কেটে ন্যাড়া মুণ্ডি হয়ে 'মাস্টারমশাই' হয়ে গেলাম, আজও আছি। ১৯৬১ সাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবে ইডেন উদ্যানে চেতলা আসরের স্টল ও অংশগ্রহণ করা। ১৯৬৩ সাল থেকে দুর্গাপুরে বসে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভৃতি গ্রামে গঞ্জে বহু আসর গড়ি, সেবা করি, আজও করছি। শিশুদের নির্মল ভালবাসা, স্বার্থশূন্য আন্তরিকতা অম্লান সান্নিধ্য দান, আধ আধ বুলি, আমার মনপ্রাণ সব কেড়ে নিয়েছে। সবপেয়েছির আসরের সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যেও পেয়েছি, পাচ্ছি অনাবিল ভালবাসা স্বার্থশূন্য আন্তরিকতা, একাত্মতা, সহমিলন, অভেদ্যতা, নৈকট্য যা দিয়ে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাই মরি বাঁচি এখনও সব শিবিরেই যোগদান করি। কটাদিন তাদের সঙ্গ লাভ করি। শ্রদ্ধেয় স্বপনবুড়োর সঙ্গেও তাঁর শেষের দশকে বড়ই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমার এখানে এসে আমার ঘরে বসে, বাইরে বাগানে দাঁড়িয়ে আমাকে পাশে রেখে বহু ফটো তুলে গেছেন। আমাকে বলেছিলেন, 'আমার অভাবে আপনি দাঁড়িয়ে ওদের দেখেশুনে চালাবেন।' আমি বলেছিলাম, 'আমরণ আমি আপনার সংগঠন ত্যাগ করব না। 'আজ তিনি নেই' কথাটায় শুধু বেদনার উদ্রেক করে। হাসির রাজ্যে সবপেয়েছির আসরের নির্মল হাসি অমর রহে। কোন কিছুই ব্যক্ত করতে আমার ইচ্ছা ছিল না। পরম স্নেহের সোমেশ ভূঁইঞা ভাই-এর অনুরোধে এবং পরম প্রিয় সনৎ ভট্টাচার্যের পত্র মাধ্যমে পুনরুক্তিতে একটু ব্যক্ত করলাম।

শেষ করার আগে মনে পড়ছে বিশ্বকবির গাথা 'প্রেম একদিন এসেছিল নীরবে।' তাই আমার জীবনে সবপেয়েছির আসরের প্রেম একদিন এসেছিল নীরবে। তাই বাঁধন বিহীন সেই বাঁধনে আমি বাঁধা সামগ্রিক সংগঠনের কাছে। আর একটি কথা আমি না বলে পারলাম না—মহামান্য সংগীতজ্ঞ পান্নালাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত—'যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি সেথা যেতে প্রাণ চায় মা'। একমাত্র সবপেয়েছির আসরেই পাওয়া যায় নির্মল শিশুদের ভালবাসা এবং তাদের ভালবেসে পাওয়া যায় নির্মল আনন্দ। আনন্দই ব্রহ্ম। তাই আমি সবপেয়েছির আসরে ছিলাম, আছি, থাকব। উল্লিখিত অভিব্যক্তি আমার আত্মপ্রকাশের প্রয়াস নয়। দীর্ঘদিন আসরের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণ প্রকাশের জন্যই এই অভিব্যক্তি। এটা আত্মসমালোচনা ও আসর বন্ধুদের কাছে আত্মনিবেদন, সবপেয়েছির আসরের স্বরূপ ব্যক্তই মুখ্য উদ্দেশ্য।

আসরের খবর

❐ সম্প্রতি বেহালার শিশুভবনে বাংলাদেশের খেলাঘর আসরের কর্মী সুনীল সরকার মহাশয়-কে সবপেয়েছির আসরের পক্ষ থেকে চা-চক্রে আমন্ত্রণের মাধ্যমে সম্মানিত করা হল। মূলসত্যসেবী, সহ মূলসত্যসেবী সহ দপ্তর সচিব, প্রকাশনা সচিব এবং সম্পত্তি সংরক্ষণ সচিব সহ দঃ কলকাতা অঞ্চলের সংগঠক ও সহ সংগঠকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়।

❐ বেহালা বোধয়ন সবপেয়েছির আসরের বাৎসরিক অনুষ্ঠান বিবেকানন্দ মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত হল। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ভাইবোনেরা তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলের মন জয় করেন। এছাড়াও বেহালা বোধয়ন আসরের শিক্ষক- শিক্ষিকারা বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ, সবপেয়েছির আসরের মূলসত্যসেবী দিলীপ চক্রবর্তী এবং সহমূলসত্যসেবী জয়দেব বারুই এর উপস্থিতি এবং বেহালা বোধয়ন-এর সংঘমিত্রা তথা সবপেয়েছির আসরের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যা রিক্তা ঘোষ-এর পরিচালনায় সমস্ত অনুষ্ঠানটি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। মহারাজ এবং মূলসত্যসেবী এই বিশেষ ভাইবোনেদের সমাজের সামনের সারিতে এগিয়ে নিয়ে আসার কথা উল্লেখ করেন। উপস্থিত সকলেই ভাই-বোনেদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন।

❐ অগ্নিশিখা সবপেয়েছির আসরের ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বাৎসরিক শিশু-কিশোর উৎসব অনুষ্ঠিত হল ১২ই জুন ২০২২ (রবিবার) সন্ধ্যে ৬ ঘটিকায়। আসর পতাকা উত্তোলন করেন উত্তর কলকাতা অঞ্চলের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য পুলকরঞ্জন দে মহাশয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন অনুষ্ঠান সভাপতি যুগল সেন মহাশয়, স্বপন বুড়ো, ৺সন্তোষ দাস ও শিক্ষাগুরু ৺সনৎ ভট্টাচার্য-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে। উপস্থিত আসরবন্ধু, কর্মী, সোনারকাঠি ও অভিভাবক সকলে একে একে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। শিক্ষাগুরু ৺সনৎ ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন আসর সভাপতি নারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়, সঙ্গে নীরবতা পালন করা হয়। এরপর মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা ঈশিতা সাহার নৃত্যের মাধ্যমে। উপস্থিত অঞ্চল সংগঠক শিবাশীষ বিশ্বাস, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মনোতোষ নাগ, শিক্ষক অজয় চক্রবর্তী, সমাজসেবী ভীষ্মদেব কর্মকার, লেখক স্বপন দাস, শীতল দাস ও সংগঠন সচিব নীলরতন সাহা প্রমুখ বক্তব্যের মাধ্যমে শিশু-কিশোর প্রতিভা বিকাশ ও সুস্থ সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে সংগঠনের ভূমিকার উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে অগ্নিশিখা স.পে.আ.-সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, ড্রিল, ছড়া, ভঙ্গীগীতি, ব্রতচারী ও যোগাসন, নবমিতালি স.পে.আ.-ছৌ নৃত্য, শ্রী রামকৃষ্ণ স.পে.আ.-লোকনৃত্য, আলো ছন্দ ডান্স গ্রুপ নৃত্য পরিবেশন করে প্রশংসা অর্জন করে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংঘমিত্র (সম্পাদক) ধীমান সাহা মহাশয়।

২০শে জুন, ২০২২ বিকেল ৫টায় পালিত হল আসরের প্রতিষ্ঠা দিবস ও শিশু যোগাদিবস। এই অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন আসরের সংগঠন সচিব নীলরতন সাহা মহাশয়। সোনারকাঠি ভাইবোনেরা যোগা ও জিমন্যাস্টিক প্রদর্শন করে প্রশংসা অর্জন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও পরিচালনা করেন সভাপতি নারায়ণ বিশ্বাস ও যোগ প্রশিক্ষক জয়দেব মুন্সী।

রানাঘাট সবপেয়েছির আসরের ৬৩ বৎসরে পদার্পণ

গত ১০ই মে ২০২২ (২৬শে বৈশাখ ১৪২৯) রানাঘাট সবপেয়েছির আসর ৬৩তম বর্ষে পা রাখল। ঐদিন সকাল ৭.৩০ মিঃ সোনারকাঠি ভাই-বোন, কর্মী ভাই-বোন, আসরের সংঘমিত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সহ আসরের অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শুভানুধ্যায়ীরা হাজির হন আসর প্রাঙ্গণে।

সকাল ৮.৩০মি. সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দির ও নিস্তারিণী কালিমন্দিরে আসরের নামে পুজো দিয়ে আসর প্রাঙ্গণে ঘটস্থাপন করে আসরপতাকার পুজো করে পুজোর কাজ সম্পন্ন করা হয়। পুজো করেন আসরের কোষাধ্যক্ষ নরসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পুজোর পর সবাইকে প্রসাদ ও মিষ্টি বিতরণ করে সকালের অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

শুরু হয় বিকেলের অনুষ্ঠান বিকেল ৪.৩০ মি. আসর প্রাঙ্গণে। উপস্থিত আসরের সংঘমিত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্রের দপ্তর সচিব প্রভাস রায়। উত্তর নদিয়ার অঞ্চলের সংগঠক শ্রী সুমন বসাক, সহ-সংগঠক শ্রী রাজকুমার দাস ও প্রস্তাবিত সহায়ক শ্রী প্রসেনজিৎ রায় মহাশয়। আসর পতাকা উত্তোলন করেন মূলকেন্দ্রের দপ্তর সচিব শ্রী প্রভাস রায় মহাশয়। এরপর পতাকাগীতি, সংকল্প বাক্য পাঠ। সোনারকাঠি বোনেরা সবাইকে চন্দনের ফোঁটা ও হাতে রাখি পরিয়ে আশীর্বাদ নেয়। শুরু হয় সমবেত ব্যায়াম, ছড়ার ব্যায়াম, ব্রতচারী ও ভঙ্গিগীতি। সন্ধ্যের সময় ৬৩টি প্রদীপ ও ৬৩টি মোমবাতি প্রজ্বলন করেন আসরের সংঘমিত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন আসরের সাংস্কৃতিক সচিব শ্রীমতী কাবেরী সাধুখাঁ মহাশয়া। আসরের ভাইবোনেদের পরিবেশিত অনুষ্ঠানগুলি সকলের প্রশংসা লাভ করে। নিজের ব্যক্তিগত মালিকানার জমিতে আসরের কর্মসূচি চালাবার জন্য সহযোগিতা করছেন বিশিষ্ট শিশুদরদী শ্রী নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

❒ পশ্চিম মেদিনীপুরের বঙ্কিম স্মৃতি সবপেয়েছির আসরের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল ৭ জুলাই ২০২২ বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালক বিভাগ প্রাঙ্গণে। আসরের পতাকা উত্তোলন, মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আসরের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত বঙ্কিম বিহারী পাল, স্বপন নিয়োগীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। স্কুল প্রাঙ্গণে অবস্থিত চারজন মনীষীকেও শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। আসরের সোনারকাঠি ভাই-বোনেরা ছড়া, ভঙ্গীগীতি, সংগীত, আবৃত্তি পরিবেশন করে। অভিভাবকরাও সংগীত পরিবেশন করেন অনুষ্ঠানে। ২০২০ এবং ২১ সালে করোনা পরিস্থিতির কারণে আসরের কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও অনলাইনের মাধ্যমে আসরের সোনারকাঠিদের বিভিন্ন রকম শিক্ষামূলক বিষয়ে আলোচনা করা হতো। সেই সময় অনলাইনের মাধ্যমে আবৃত্তি, অংকন এবং পত্রলিখন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এদিন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করায় চার সোনারকাঠি ভাইবোনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। আসরের নিয়মিত পরিচালনার জন্য সত্যসেবী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সায়রী অধিকারী, শুভজিৎ দাস, শিবম দাস, পৌলমী চৌধুরী এবং প্রিয়ম ভট্টাচার্য-র হাতে বাঁশি তুলে দেন আসর সংঘমিত্র নিখিল দাস। অনুষ্ঠানে আসরের সভাপতি সুকুমার পড়িয়া, বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অরূপ ভূঁইঞা, বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের পরিচালন কমিটির সভাপতি অঞ্জলি সিনহা, নারায়ণ বিদ্যামন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অর্পিতা সেন, আসর সংঘমিত্র নিখিল দাস, সহসংগঠক সুব্রত খাঁড়া, পরিষ্কার মাহাত, সৈনিক সব পেয়েছির আসরের কর্মী রবীন্দ্রনাথ পাত্র, আসর সাংস্কৃতিক সচিব স্বপন দত্ত, তথাগত দাশগুপ্ত, প্রশিক্ষক মিতা চৌধুরীসহ অন্যান্যরা হাজির ছিলেন। অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন অঞ্চল সংগঠক পূর্ণেন্দু জানা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আসরকর্মী দীপান্বিতা ব্যানার্জি, সায়রি অধিকারী। সংঘমিত্র নিখিল দাস বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে দু'বছর সোনারকাঠি ছাড়াই আসরের কর্মীরা প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেছিল। কিন্তু এবারে পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় সোনারকাঠিদের উপস্থিতে অনুষ্ঠান করতে পারায় খুব ভালো লেগেছে। করোনা পরিস্থিতির পর আসর খোলায় পুরানো সোনারকাঠি সংখ্যা কিছুটা কমলেও নতুন অনেকে ভর্তি হয়েছে। মাঠ ভরে গিয়েছে কচিকাঁচাদের ভিড়ে।

শিশু ও কিশোর সংগঠন দর্শনে সবপেয়েছির আসরের ভূমিকা

উৎপল হোম রায়

শিশু ও কিশোর সংগঠনকে সম্যকভাবে জানতে হলে বা বুঝতে হলে চাই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। এমন দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে আত্মমুখী ও বিষয়মুখী দুই দৃষ্টিভঙ্গির মিলনে সৃষ্টি হবে শিশু ও কিশোর সংগঠনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আত্মমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশু ও কিশোর সংগঠন যে ভোরের আলো, বসন্তের প্রাণরস ও প্রেরণা জোগানোর নির্ঝর শক্তি। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভোরের আলো যে কি তা বোধ করা গেলেও ভাষায় তা সব সময় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কবিরা অবিশ্যি কথায় মালায় তা প্রকাশ করতে সমর্থ হন। তেমনি আত্মমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশু ও কিশোর সংগঠন কি তাও বলা খুবই মুস্কিল। যদি বলা হয় শিশু ও কিশোরদের সর্বাঙ্গীন জন্য যে সংগঠন তা হলে একে সংজ্ঞা বলা যাবে না, ধরা যাবে বর্ণনা হিসেবে।

অন্ধকার দূরীকরণে ও আলোকের দীপ্ত প্রকাশে ভোরের আলোর পরিচয়। এই প্রকাশ বা অভিব্যক্তি পরিণতি লাভ করে শিশু ও কিশোর জীবনে। ব্যক্তি নিয়ে সমষ্টি। ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রকাশের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ সমষ্টি চেতনার প্রকাশ হয়ে থাকে। তাই শিশু ও কিশোর সংগঠনকে আত্মমুখী দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা যেতে পারে সাজানো ফুল বাগান। এই বাগানে ফুল ফোটানোই হল শিশু ও কিশোর সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

শিশু যেদিন এই পৃথিবীর আলো প্রথম দেখে তখন সে থাকে কতকটা অনুভূতির বস্তু মাত্র। অনুভূতি থাকে কিন্তু তার প্রকাশ শক্তি তেমন সক্রিয় থাকে না বললেই চলে। ঠেকে ঠেকে দেখে-শুনে চিনে নেয় সব কিছু। জন্মের পর শিশু থাকে খুবই অল্প বুদ্ধির। কেমন করে তার জন্ম হলো? ছেলেবেলার পরিবেশ ও সঙ্গীরা তাকে অনেক ব্যাপারেই সচেতন হতে সাহায্য করে। শিশুবেলার সঙ্গী বলতে শুধু বাবা আর মা নন, ছোট ভাই-বোন, পাড়া বা পল্লীর নবলব্ধ বন্ধু-বান্ধব, গাছ-পালা, খেলাধূলা, ঝোপঝাড়, ফাঁকা মাঠ, নদী তীর, পুকুর ইত্যাদি আরও কত কি? এইসব মিলিয়েই শিশুর নিজস্ব জগৎ তৈরি হয়। শিশু ও কিশোরদের আপন জগৎকে ভিত্তি করেই শিশু বা কিশোর সংগঠন গড়ে ওঠে।

এই সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিত্বের সমাবেশে গড়ে ওঠে শিশু ও কিশোর সংঘ বা সংগঠন। যেখানে জিজ্ঞাসু শিশু ও কিশোর মন নিজেদের ভাব প্রকাশ ও বিনিময়ে পথ খুঁজে পায় পাথরের ঘেরা থেকে মুক্ত পাগল ঝোরার মতো। আকুলি বিকুলি করা প্রাণ প্রকাশের মন্ত্রণা পায় অনুকরণ আর অনুসরণের মধ্য দিয়েই। নিজেদের প্রাণের অফুরন্ত শক্তির পর্যাপ্ত উৎস নিয়ে তারা জেগে ওঠে স্বাধীন সত্তার মধ্যে। শিশু ও কিশোর সংগঠন যে—‘মৌমাছির চাক’ এক একটি দল, নিজেরাই তা গড়ে ও নিজেরাই সেই চাক থেকে মধু আস্বাদন করে থাকে। অফুরন্ত আনন্দ রসের যোগান পেলে শিশু ও কিশোরদের সবুজ প্রাণ ভরে ওঠে। এইভাবে গড়ে ওঠে শিশু ও কিশোর সংগঠন সব বাধা অতিক্রম করে সার্থক ও স্ব-মহিমায়।

শিশু ও কিশোর সংগঠন কবে কোথায় প্রথম গড়ে উঠেছিল তা খোঁজার চেষ্টা না করাই শ্রেয়। তবে সংঘ কথাটির উৎপত্তি হলো বৌদ্ধ সংঘ থেকে। বৌদ্ধ দর্শন

‘ত্রিপিটক’-এ প্রথম সংঘের সন্ধান মেলে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিয়ে যে গণ পরিষদ তৈরি হতো-তাই ‘বৌদ্ধ-সংঘ’ বলে পরিচিত ছিল। যে গৃহ থেকে সেই সংঘ পরিচালনা করা হতো তার নাম হতো ‘গ্রন্থাগার গৃহ’ বলে। সিদ্ধার্থ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের পিতার নাম ছিল শুদ্ধধন। তিনি মহাবিক্রমশালী শাক্য নরপতি রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। শাক্য রাজ্য গণতন্ত্রের পদ্ধতি অনুসারেই পরিচালিত হতো। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর বৌদ্ধ সংঘের সূচনা হয়। বৌদ্ধ সংঘ বা সংগঠনের মূল মন্ত্রই ছিল ‘সংঘ শরণং গচ্ছামি’। সেই হিসেবে সংঘ ও সংগঠনের কথা প্রথম উচ্চারিত হয় এই ভারতের মাটিতেই।

বয় স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলন ও সংগঠন কিশোর ও তরুণদের জগতে এক বিশেষ দিক চিহ্নের নির্দেশক। ১৯০৮ সালে শুরু হয় স্কাউট আন্দোলন ব্যাডেন পওয়েলের পরিচালনায়। যা আজও কি গণতান্ত্রিক, কি ধনতান্ত্রিক সব দেশেই পরিব্যাপ্ত। অবিশ্যি দেশ-কাল ও পরিবেশ ভেদে বয় স্কাউট সংগঠন গড়ার নিয়ম বিধির কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে। লেডি ব্যাডেন পাওয়েলের নেতৃত্বে বয় স্কাউট সংগঠন গড়ে ওঠার বেশ কিছু পরে গার্ল গাইড আন্দোলন তাঁদের বিশ্বব্যাপী সংগঠনের শুভ সূচনা করে। পরাধীন ভারতের বিভিন্ন শহর ও গঞ্জে শিশু-কিশোর ও তরুণদের সংগঠন রূপে বয় স্কাউট ও গার্ল গাইড গড়ে ওঠে সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রথম দিকে বিভিন্ন ইংরেজি স্কুলগুলিতে এবং পরে তা পূর্ণ সংগঠনের রূপ নেয়।

ভারতীয় অনুশাসন মেনে নিয়ে অবিভক্ত বাংলায় গুরুজি গুরুসদয় দত্তের চেষ্টা ও পরিচালনায় গড়ে ওঠে প্রথম শিশু ও কিশোর সংগঠন ‘ব্রতচারী’ সংগঠন। ব্রতী বালক ও বালিকাদের নৃত্যালি ও কৃত্যালির মাধ্যমে ব্রতচারী গ্রামে মানব অধিকারের দীক্ষার মাধ্যমে শুভ সূচনা হয় ব্রতচারী আন্দোলনের। সরকারি উদ্যোগের অভাবে এই আন্দোলন পরাধীন ভারতে খুব বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

আনন্দবাজার পত্রিকার ‘আনন্দমেলা’ শিশু বিভাগের পরিচালক ‘মৌমাছি’ ছদ্ম নামের আড়ালে থেকে ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে তোলেন ‘মণিমেলা’ রূপী শিশু ও কিশোর সংগঠন। ‘আনন্দমেলা’র পাতায় ‘মৌমাছির চিঠি’ মারফৎ বিভিন্ন নির্দেশ দানের মাধ্যমে ‘ভারতবর্ষ’ ও ‘বাংলাদেশে’ সর্বসাকুল্যে গড়ে ওঠে প্রায় ৪০০টি ‘মণিমেলা’। বর্তমানে অবিশ্যি বাংলাদেশে ‘মণিমেলা’ সংগঠনের কোনও শাখা নেই।

‘মণিমেলা’ রূপী শিশু ও কিশোর সংগঠনের প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যে যুগান্তর পত্রিকার ‘ছোটদের পাত্‌তাড়ি’ শিশু বিভাগের পরিচালক ‘স্বপন বুড়ো’ ছদ্মনামের আড়ালে থেকে ‘সবপেয়েছির আসরের’ সূচনা করে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজ্যে। এমনকি এশিয়ার কয়েকটি দেশ—যেমন চিন, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি দেশেও ‘সবপেয়েছির আসর’ সংগঠন প্রসারিত হয়। প্রতিষ্ঠার দিন থেকে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উৎসব পালন পর্যন্ত সবপেয়েছির আসরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে সততই বলতে ইচ্ছে হয় এমন একটি শিশু ও কিশোর সংগঠন যেখানে শিশু ও কিশোরেরা সব কিছু পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে মনের আনন্দকে। শিখেছে অভিযাত্রী ও শিবির মারফৎ সংগঠনের খুঁটিনাটি শিক্ষা ও শৃঙ্খলা শিখেছে সমাজসেবা, দেশ, পিতা-মাতা, প্রতিবেশির প্রতি কর্তব্য এবং গুরু দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞান আসর মারফৎ সদস্য-সদস্যাদের করে তুলছে বিজ্ঞান মনস্ক। শিল্প প্রদর্শনী সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতিকে উপহার দিয়েছে একদল শিল্পী ও ভাস্কর। গড়ে তুলছে সত্যসেবী পরীক্ষা ও ব্যাজ পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে একদল গৌরবান্বিত কর্মীদল ও আগামী দিনের ভবিষ্যৎ দেশ নায়কদের। ‘সবপেয়েছির আসরে’-র পঞ্চাশ বছরের গৌরবময় ইতিহাসকে এই ছোট প্রবন্ধে সীমাবদ্ধ রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সুন্দরভাবে প্রতিটি আসর পরিচালনার জন্য শিক্ষিত নায়ক অর্থাৎ সত্যসেবী রাখা বাধ্যতামূলক। নায়ক অর্থাৎ সত্যসেবীর প্রতি আনুগত্য রেখে যে আদর্শ

শিক্ষায় নানান বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে 'সবপেয়েছির আসরে'র সদস্য—সদস্যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে তা আমি নিজে লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন সব পেয়েছির আসর কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে। বিশেষ করে জাতীয় খেলাধূলার ক্ষেত্রে 'সবপেয়েছির আসরের' অবদান নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'স্বপনবুড়ো' একদিন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ভবিষ্যতে সুদূর প্রসারী হয়েছে আজ 'সবপেয়েছির আসরে'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ব্যাপক কর্মসূচি বিচার করে এ কথাটা নিঃসন্দেহে সকলেই স্বীকার করবেন।

অবহেলিত ভারতীয় শিশু ও কিশোরেরা 'সবপেয়েছির আসর' রূপী জাতীয় প্রতিষ্ঠান মারফৎ দেশ-দশের একজন হয়ে দাঁড়াতে শিখুক এই প্রার্থনা ও বিশ্বাস নিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আমার প্রাণের মানুষ সনৎদা

স্বপন কুমার রায়

সবপেয়েছির আসরের শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় সনৎ ভট্টাচার্য অর্থাৎ আমাদের সনৎদার সঙ্গে আমার পঞ্চাশ বছরের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। একই কর্মক্ষেত্র স্টেট ব্যাঙ্কের একই শাখাতে কাজ করতাম। সেই সূত্র ধরেই শারীর শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ নেবার সুযোগ ঘটে। সেই সময় (১৯৭৩-৭৪) আমি ব্রতচারী সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ব্রতচারী বিষয়ে সনৎদা আমাকে নানারকম পরামর্শ দিতেন। ব্রতচারী সমিতির পূর্ণাঙ্গ শিবিরে আমি ঢালি নৃত্য শিখেছিলাম। কিছু ভুলত্রুটি ছিল, সনৎদা এই ভুলত্রুটি সংশোধন করে দেন। তিনি এই ঢালি নৃত্যের উপর একটি ছড়াও আমাকে লিখে দিয়েছিলেন যাতে আমি ভুলে না যাই। ব্রতচারী আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন সনৎদা তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম নায়ক। রবীন্দ্র সদনে ন্যাশনাল ইউথ কয়্যারের একটি অনুষ্ঠান ছিল। প্যায়ারী জন্মভূমি গানটি দলের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে পরিবেশন করেছিলাম। ওই অনুষ্ঠানে সনৎদাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সনৎদার পরামর্শে এই গানটি সবপেয়েছির আসর মূলকেন্দ্রের (তদানীন্তন বাগবাজার যুগান্তর অফিস) কেন্দ্রীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। মূলকেন্দ্রের প্রশিক্ষক, দঃ কলকাতার সহঃসংগঠক এবং প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলাম। কর্মক্ষেত্রে একই (শাখা) অফিসে থাকার সুবাদে সনৎদার বিভাগে প্রায়ই যেতাম ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ নিতাম। সনৎদাও কাজের তাগিদে আমার বিভাগে আসতেন এবং আমার কাছেও আসতেন। একদিন হঠাৎ সনৎদা বললেন "স্বপন দেখ তো — ব্যাঙের ছড়াটা মজা করে ছোটদের উপযোগী করে লেখা যায় কিনা, তার পরদিন ছড়াটা লিখে নিয়ে এলাম এবং ভঙ্গিমাও দিলাম—"ব্যাঙের মাথায় হোল টাক। ব্যাঙ বলে ভাই বদ্যি ডাক"। সনৎদা দেখে বললেন, "বাঃ খুব ভাল হয়েছে"। এরপর কেন্দ্রে ছড়াটা মঞ্জুর হলো। এইভাবে সনৎদার পরামর্শে লিখলাম এবং ভঙ্গিমা দিলাম যথাক্রমে 'ওপাড়াতে ছিল এক ভুঁড়িওয়ালা সর্দার', 'চল ভাই চল ভাই শিকারেতে যাই', 'কু ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্', 'হিংসুটে এক বাঁদর' ইত্যাদি। একদিন সনৎদা একটা ছড়ার সুর ও ভঙ্গিমা দিতে বললেন। "আলবাৎ বীর বটে তালপাতা সিং"। এই ছড়াটি মুরাডি শিবিরে (পুরুলিয়া) শিখিয়েছিলাম। এইভাবে সনৎদার পরামর্শে ভঙ্গীগীতির ভঙ্গিমা দিয়েছিলাম। "খরবায়ু বয় বেগে" যেটা ১৯৭৭ সালে আলিপুর দুয়ার শিবিরে শেখানো হয়েছিল। ১৯৭৭ সালের কথা, একদিন সনৎদা আমার বিভাগে এলেন এবং বললেন "স্বপন, রাজাবাজার বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতিতে লাঠি, ছুরি ও জুডোর প্রশিক্ষণ হচ্ছে। চল প্রশিক্ষণ নিই। প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন প্রখ্যাত লাঠি শিক্ষক ফণীভূষণ ঘোষ এবং শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। সেইদিন থেকে সপ্তাহ ধরে রোজ অফিসের ছুটির পর প্রশিক্ষণ নিতে যেতাম। সনৎদা প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এইভাবে সনৎদা আমাকে একদিন সনৎদার প্রাণের আসর নবমিতালিতে নিয়ে গেলেন। সেখানে 'গুজরাটি ঘটি গড়বা' শেখালাম। আমি মাউথ

অর্গান ও বাঁশি বাজাতে জানতাম। একদিন সনৎদা আমাকে বললেন, নবমিতালি সবপেয়েছির আসরের অনুষ্ঠানে ফ্যান্সি ড্রিলের সাথে বাঁশি ও মাউথ অর্গান বাজাতে। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। অনুষ্ঠান খুবই ভাল হয়েছিল। কয়েক বছর আগে সনৎদার পরামর্শে প্রাক্তন প্রকাশনা সচিব প্রদ্যোৎ ঘোষের লেখা নাট্যরূপ মহিষাসুর মর্দিনীর ছৌ নৃত্যের আদলে পরিচালনা করেছিলাম নবমিতালির সোনারকাঠি ও কর্মীদের নিয়ে। এক্ষেত্রে সনৎদার অবদান ভোলার নয়। প্রশিক্ষণের সর্ব বিষয়ে সনৎদা ছিলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক। লোকনৃত্য, ছড়া, ড্রিল, যোগব্যায়াম, ব্রতচারী, গান, খো খো, কবাডি, সর্ব বিষয়ে সনৎদা ছিলেন প্রধান পরামর্শদাতা। মনে আছে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের ঘরে সনৎদা আমাদের গুজরাটি রাস্‌নৃত্য 'ডান্ডিয়া নৃত্য' শিখিয়েছিলেন। সংস্কৃতে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। সংস্কৃতে তিনি মাস্টার ডিগ্রির অধিকারী ছিলেন। সনৎদার কাছে একটা ডায়েরী ছিল, তাতে সবপেয়েছির আসরের যা কিছু শিক্ষণীয় বিষয় ছিল সবগুলো লিপিবদ্ধ ছিল। এটা একটা অত্যন্ত মূল্যবান ডায়েরি। যদি সংগ্রহ করা যায়, অনেক কিছু অজানা মূল্যবান তথ্য জানা যাবে।

সবপেয়েছির আসরের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তিকা, ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে সবকিছুই সনৎদার শিক্ষণে, পরামর্শে। ব্রতচারী গীতি মালিকার সামগ্রিক পরিচালন ও শিক্ষণ নিয়ম করে শিশু ভবনে মহড়া হতো। ব্রতচারীর প্রত্যেকটা গান নির্ভুলভাবে তিনি শিক্ষাদান করতেন। সনৎদা ১৯৯৩ সালে ব্যাঙ্কের চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপরেও আমার অফিসে নানা কাজে আসতেন। একদিন এসে বললেন, স্বপন, হনুমানের একটা ছড়া লিখতে পারো? আমি লিখলাম— "এই হনুমান কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি"। সনৎদা সঙ্গে সঙ্গে তার ভঙ্গিমা তৈরি করে পরবর্তী শিবিরে শিখিয়ে দিলেন।

সনৎদা যতক্ষণ জেগে থাকতেন, আসর ছাড়া কিছুই চিন্তা করতে পারতেন না। নব মিতালি আসর ছিল সনৎদার মানসপুত্র। কুঁদঘাট থেকে রোজ বিকেল শ্যামবাজার আসরের মাঠে যেতেন এবং শেষ মেট্রোতে বাড়ি ফিরতেন। যতক্ষণ বাড়ি থাকতেন বই পড়তেন, ছড়া লিখতেন, ভঙ্গি দিতেন। আমার পরিচালনায় ড্রিলের একটা মিউজিক ক্যাসেট "সুরে তালে ছন্দে" প্রকাশিত হয়েছিল। সনৎদা আমার বাড়ি এসে সেই সব সুর শুনতেন এবং সংশোধন করে দিতেন। সনৎদার হাত ধরে সবপেয়েছির আসরের বহু প্রশিক্ষক তৈরি হয়েছে। আমি যতদিন আসর করছি ততদিন সনৎদাময় ছিলাম। দেশে এলো করোনা মহামারী। সনৎদা দু'বৎসর বাড়িতে ছিলেন। কোন আসরের কর্মসূচিতে যেতে পারতেন না। নবমিতালিতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। শরীরে বার্ধক্যজনিত রোগ বাসা বাঁধতে লাগলো। ফোনে শরীরের অবস্থা জানতে চাইলে বলতেন পা নিয়ে খুব ভুগছেন। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। আমি সনৎদাকে একটা ইলেকট্রিক হটপ্যাড কিনে দিয়েছিলাম। কিন্তু সনৎদা ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। যাইহোক, এপ্রিল ২০২২-এর শেষের দিকে বিদেশ চলে যাই। কিন্তু মে মাসের ৩ তারিখে হোয়াটস আপ দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। সনৎদার মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি নির্বাক হয়ে পড়ি।

সনৎদা ছাড়া সবপেয়েছির আসর চিন্তা করা যায় না। তবুও তাঁর মনের আস্তানা এই সবপেয়েছির আসর অর্থাৎ মানুষ গড়ার কারখানাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, যথেষ্ট সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাহলেই সবার প্রাণের গুরুর প্রতি প্রকৃত কর্তব্য পালিত হবে।

টুম্পার মিতালি

প্রদীপ রায় *(সহ-সভাপতি)*

[বিশাল একটা বটগাছ, সে থাকতো ইষ্টিশানের ধারে। হরেক রকম পাখি আর ছোট্ট মেয়ে টুম্পা থাকতো তাকে সারাদিন ঘিরে। জমজমাট ছিলো তাদের সংসার। মিষ্টি মেয়ে টুম্পা রোজ সকাল হলেই ছুটে আসতো তার বন্ধুদের নিয়ে। মনের সুখে তারা গান গাইতো আর নাচতো।]

টুম্পা (গান গাইছে নেচে নেচে)—

ঝির ঝিরা ঝির, তির তিরা তির
ঐ যে বাতাস বয়,
আয়না হেথায় দুহাত মেলে
আকাশ ডেকে কয়
দূরের ঐ রেলগাড়িটা
ঝক্ ঝকা ঝক্ চলে,
কত পাখি গায় যে গান
(এই) বুড়ো বটের কোলে।
ঐ কাঠঠোকরা থাকে হেথা
ছোট্ট ফোকর মাঝে,
কট্ কটাকট্ ঠুকেই চলে
সকাল দুপুর সাঁঝে।
টিয়া পাখির টিকির টিকির
লাল দুটি ঐ ঠোঁটে,
কাঠ পিঁপড়েও কম যায়না
তাদের থেকে মোটে।
আমি যে গো ওদের সাথী
নামটি আমার টুম্পা,
কথায় কথায় নেচে বেড়াই
তা ধিনা ধিন ধিনতা।
খুশী খুশী দেদার খুশী
বটের ঝুড়ি দোলনায়।
দোল দোলা দোল দুলেই চলি
রঙিন সুখের আশায়।।

রেলগাড়ি — ঝুক্ ঝুক্ ঝিক্ ঝিক্
আমি রেলগাড়ি,
সরে যাও লাগে যদি
শুধু দেব থুড়ি।
রেড্ আছে সিগ্‌নাল
থেমে পড়ি তাইতো,
টিকিটটা চেক করা
এবারটা চাইতো।
বটদাদু এসে গেছে
গুড ভেরি মর্নিং,
কথা কিছু বলে নিই
ঐ বাজে ওয়ার্নিং।
ব্যাপার তো ভালো নয়
মুখ দেখি শুকনো,
চুলগুলো পেকে গেছে
শরীরটা রুগ্‌নো।

বটগাছ — সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বয়স আমার এগিয়ে চলেছে। বাঁচবো না জানি আর কত দিন।

টুম্পা — সে কি বটদাদু, আমরা আছি তবে কি জন্য? তোমাকে আমরা চির সবুজ করে রাখবো আমাদের মাঝে।

সবাই — বাঃ, বেশ বলেছো, টুম্পা দিদি বেশ বলেছো।

রেলগাড়ি — চলি, সবে গুডবাই
কু ঝিক্ ঝিক্
গার্ড দেয় হুইসেল্
থেকো সবে ঠিক্।

সবাই — বাই বাই গুড বাই (২)।

টুম্পা — বটদাদু তোমরা এই গাছেরা আমাদের কি আনন্দেই না রেখেছো। তোমাদের পাতায় পাতায় কত ফুল, কত ফল, কাঠবেড়ালি আর টিয়াদের মত পাখি আর জীব তোমাদের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠে। কিন্তু তোমরা এমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন? ঠিক মত তোমাদের খাওয়া কি হচ্ছে না?

বটদাদু — কার্বনডাই অক্সাইড ভাই যে আমাদের কাছে আর আসছে না, সেই যে আমাদের খাবার তৈরি করে দেয়।

কার্বনডাই অক্সাইড (Co_2) — কি করি আমি বলতো? তোমরাই তো থাকছো না, মানুষেরা যে তোমাদের কেটে কেটে কত বড় বাড়ি বানাচ্ছে, কারখানা তৈরি করছে। চারিদিকের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আমরা জন্মাচ্ছি বটে কিন্তু থাকার জায়গা পাচ্ছি না। তোমরা আমাদের নিলে তো আমরা থাকবো! তাই আমরা বাঁচবার জন্য টুম্পা দিদিদের মত মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়ছি।

অক্সিজেন — আর ওদের শরীর বিষাক্ত করে অসুস্থ করছো, মেরে ফেলছো। একমাত্র আমিই পারি ওদের সুস্থ করতে। তোমরা গাছের মধ্যে না গেলে আমরাই বা তৈরি হই কেমন করে। তাইতো বাতাস আমাকে পায়না আর টুম্পাদিদিরা কেমন ঝিমিয়ে পড়ে।

টুম্পা — এখন বুঝতে পারছি, হঠাৎ করে আমি হাঁফিয়ে যাই কেন? আর ডাক্তার কাকুরা আমার নাকে নল দিয়ে তৈরি করা অক্সিজেন ঢুকিয়ে আমাকে সুস্থ করে তোলে। আচ্ছা অক্সিজেন ভাই তোমরা বাতাসে কেমনভাবে আসো?

অক্সিজেন — টুম্পা, তুমি সালোক সংশ্লেষের কথা বইতে পড়োনি?

টুম্পা — পড়েছি বটে, কিন্তু ভালো করে বুঝিনি।

অক্সিজেন — শোনো তবে, কার্বনডাইঅক্সাইড তেল, ধোঁয়া আর নানান কারণে তৈরি হয়। গাছ তাকে আকর্ষণ করে। আর তার গোড়ায় যে জল থাকে, তা পাতায় পাতায় চলে যায়, আর এই দু'জনের কাছে যখন সূর্যি ঠাকুর এসে পৌঁছায় সেখান থেকে তৈরি হয় বটদাদুদের খাবার আর আমি। সেই খাবার খেয়ে গাছেরা বেঁচে ওঠে আর আমি বাতাসে মেলে দিই নিজেকে। এটাকেই বলে সালোকসংশ্লেষ।

জলকণা — আর আমরা জলকণারা যখন পাতায় পাতায় পৌঁছে যাই রবি মামার তাপে আমরা বাষ্প হয়ে হয়ে যাই মেঘ। আর সেখান থেকেই বৃষ্টি হয়ে নেমে পড়ি মাটিতে। রূপ দিই নদী, খাল, বিল, সমুদ্রে।

টুম্পা — আর তাইতো এই ধরিত্রী মা হয় শস্য শ্যামলা সুন্দর। নইলে—

কাঠঠোকরা — খরা, বান আর নানান দুর্যোগ।

টুম্পা — বাবা! এতো মজার ব্যাপার, গাছেদের কত দায়িত্ব। বটদাদুদের জন্যও আমরা এত সুন্দর করে বেঁচে আছি। আর তাকেই দুষ্টুলোকেরা মেরে ফেলছে। এ আমরা কিছুতেই সহ্য করবো না।

সবাই — ঠিক! ঠিক! এর বিহিত একটা কিছু করতেই হবে আমাদের।

কাঠঠোকরা — শোনো টুম্পাদি, কাল যখন আমি ঐ কোটরে বসে একটু ঝিমোচ্ছিলাম তখন শুনি একদল লোক বলছে, আসছে কাল তারা কাঠুরেদের পাঠাবে। তারা বটদাদু আর অন্য গাছ ভাইদের কেটে কুটে সাফ করে দেবে। আর সেখানে তৈরি করবে বিশাল ইমারত, কি দুষ্টু বলতো ওরা!

সবাই — কি! এত বড় বাড় বেড়েছে
সইবো না কো আর
যেমন করে দিতেই হবে
উচিত সাজা এবার।
টুম্পাদি তুমিই বলো
কি করবো মোরা!
এমন উপায় বের করো না
নেইকো যার জোড়া

টুম্পা — সবাই এবার আমার কাছে এসো, কানে কানে কথা শুনে যাও। কাউকে বলোনা যেন। কালকে দেখবে এবার মজাটা কি হয়!

(সবাই শুনে)

বাঃ বাঃ বেশ মজাগো
এবার তবে চলো,
কালকে সকাল হবে যখন
আসতে নাকো ভুলো।

[পরদিন সকাল — টুম্পা, তার বন্ধুরা মিলে লুকিয়ে আছে স্টেশন ঘরের পাশে। একদল কাঠুরে বটদাদুকে কাটতে লাগলো চারপাশ দেখে।]

কাঠুরের দল —

খট্‌খট্ কাটি গাছ,
এই একবার,
ঠুক ঠুক্ ঠুকে যাই বার শত বার।
যাও সবে সরে যাও, দূর থেকে দেখো,
সাফ্‌সুফ্ করে দেবো কিছু টাকা রেখো।

[টুম্পার নেতৃত্বে কাঠবেড়ালি, কাঠপিঁপড়ে মার্চ করে এগিয়ে এসে ওদের গায়ে কামড় দিল।]

বাপ্ বাপ্ ছেড়ে দাও
কেন কামড়াও?
কাজ টাজ তোলা থাক্
কত টাকা চাও?
ফুলে ফেঁপে ঢোল হলো, কান কট্‌কট্
ছেড়ে দাও চলে যাই ঝট্ পট্ পট্।

[চিৎপাত হয়ে চিৎকার করতে লাগলো]

[সবাই বটগাছকে নিয়ে আনন্দ করতে লাগলো]

হারের হুররে টুম্পা দিদির জয়
আমরা সবাই সবার মিতা
নেইকো মোদের ভয়।

(টুম্পা) — দাদুভায়ের ভালোবাসায়, আমরা বেঁচে আছি।

(কাঠঠোকরা)

পাতার মাঝে ঘুরে বেড়াই, খুশীর নেশায় হাসি
গানে গানে খেলায় খেলায় হই যে মোরা আপন
হিংসুটের দেবোই সাজা এইতো মোদের পণ।
দেখলে তো ভাই দুষ্টু লোক কার হলো আজ জয়
পরের ক্ষতি চাইলে পরে, নিজের কিবা হয়।

[চরিত্র—টুম্পা, বটদাদু, কাঠঠোকরা, টিয়া, কাঠুরের দল, অক্সিজেন, কার্বণডাইঅক্সাইড, জলকণা, বন্ধু দল, কাঠপিঁপড়ের দল ইচ্ছা করলে গান তৈরি করে নেওয়া যাবে।]

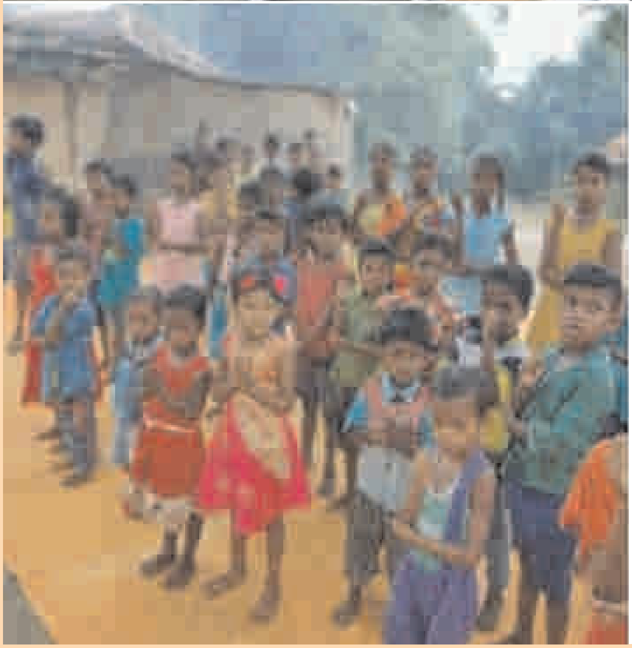

সবপেয়েছির আসর সাত দশক
অনন্য
সনৎদা

সনৎ ভট্টাচার্য
মৃত্যু:৩মে ২০২২